আলোর ফুলকি

অবনীন্দ্রনাথ

আলোর ফুলকি

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কলিকাতা

ফরাসী লেখক Edmond Rostand'এর রচিত গল্পের ভাবানুবাদ করেন
Florence Yates Hann : *The Story of Chanticleer*
উহারই ভাবগ্রহণ করিয়া এই কাহিনীর রচনা ও ভারতী পত্রে
প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩২৬ - অগ্রহায়ণ ১৩২৬
গ্রন্থাকারে প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৫৪
সংস্করণ : বৈশাখ ১৩৬৩
পুনর্মুদ্রণ : আশ্বিন ১৩৭৯
ভাদ্র ১৩৮৬ : ১৯০১ শক

অন্তঃপট নন্দলাল বসু -অঙ্কিত
প্রচ্ছদ নন্দলাল বসু -অঙ্কিত ও মণীন্দ্রভূষণ গুপ্তের সৌজন্যে মুদ্রিত
অনুচ্ছদ শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় -অঙ্কিত

প্রকাশক রণজিৎ রায়
বিশ্বভারতী। ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড। কলিকাতা ১৭

মুদ্রক সিদ্ধার্থ মিত্র
বোধি প্রেস। ৫ শঙ্কর ঘোষ লেন। কলিকাতা ৬

কুঁকড়ো গা-ঝাড়া দিয়ে গলা চড়িয়ে ডাক দিলেন :
আলোর ফুল, আলোর ফুল, ফু-উ-উ-উল-কি-ই-ই আলোর ! —

পৃ ৪৬

দূরে একটা মহা বন, সেখানে বসন্ত-বাউরি 'বউ-কথা-কও' ব'লে থেকে থেকে ডাক দেয় ; কাছে পাহাড়তলির আবাদের পশ্চিমে, ঢালু মাঠের ধারে, পুরোনো গোলাবাড়ির গায়ে মাচার উপর কুঞ্জলতার বেড়া-দেওয়া কোঠাঘর ; সেখানে একটা ঘড়ি বাজবার আগে পাপিয়ার মতো 'পিয়া পিউ' শব্দ করে। যার বাড়ি তার পাখির বাতিক ; পোষা পাখি, বুনো পাখি, এই গোলাবাড়ির আর কোঠাবাড়ির ফাঁকে ফাঁকে কত যে আছে ঠিক নেই, কেউ দরজা-ভাঙা খাঁচায়, কেউ ছেঁড়া ঝুড়িতে, চালের খড়ে, দেয়ালের ফাটলে বাসা বেঁধে সুখে আছে। ও-পাড়ার ডালকুত্তো তম্মা মাঝে মাঝে মুরগির ছানা চুরি করতে এদিকে আসে, কিন্তু পাখিদের বন্ধু পাহাড়ী কুত্তানি জিম্মার সামনে এগোয়, তার এমন সাহস নেই। বাড়ি যার, সে যখন বাইরে গেল, পাহারা দিতে রইল জিম্মা, আর রইল মোরগ-ফুল-মাথায়-গোঁজা কুঁকড়ো— সে এমন কুঁকড়ো যে সবার আগে চোখ খোলে, সবার শেষে ঘুমে ঢোলে।

এই কুঁকড়োর চার রঙের চার বউ। সাদি, মেমসাহেবের মতো গোলাপী ফিতে মাথায় বেঁধে সাদা ঘাগরা প'রে ঘুর-ঘুর করছেন ; কালি, চোখে কাজল আর নীলাম্বরী শাড়ি-পরা মাথায় সোনালী মোড়া বেনে খোঁপা, যেন কালতে ঠাকরুন ; সুরকি, তিনি ঠোঁটে আলতা দিয়ে, গোলাপী শাড়ি প'রে যেন কনে বউটি ; আর খাকি, তিনি ধূপছায়া রঙের সায়া জড়িয়ে বসে রয়েছেন, যেন একটি আয়া।

বেলা পড়ে আসছে, গোলাবাড়ির উঠোনে বিকেলের রোদ এসেছে। সফেদি, সিয়াঙ্গী, সুরকি, খাকি, গুলবাহারি সব মুরগি মিলে জটলা করছে। বাচ্ছারা এক দিকে একটা কেঁচো নিয়ে টানাটানি মারামারি চেঁচামেচি বাধিয়ে দিয়েছে ; ঘরের মধ্যে ঘড়ি সাড়া দিলে "পিয়া পিউ।" সফেদি বলে উঠল, "ওই পাপিয়া ডাকল।" খাকি তাড়াতাড়ি ছুটে এসে বললে, "পাপিয়া লো কোন্ পাপিয়া? বনের না ঘরের? ঘড়ির ভিতরে যার বাসা, সে কি ডাক দিলে।" সফেদি তখন ধান খুঁটে খুঁটে গালে দিচ্ছিল ; এবার খুব দূর থেকে শব্দ এল, "পিউ পিউ।" সফেদি বললে, "এ যেন বনেরই বোধ হচ্ছে। শুনছিস, কত দূর থেকে ডাক দিয়ে গেল।" ঘড়ির মধ্যে থেকে যে 'পিয়া' ব'লে থেকে থেকে দিনে রাতে অনেকবার ডাক দেয়

খাকি একবার আড়াল থেকে তার চেহারাখানি দেখে নেবার জন্যে থাকে-থাকে কুঠিবাড়ির দিকে ঘুরে আসে ; 'পিউ' বলে যেমন ডাকা, অমনি সে সোনার মন্দিরের মতো সেই ঘড়িটার কাছে ছুটে যায়, খুট করে দরজা বন্ধ হবার মতো একটা শব্দ শোনে, তখন চক্ষুশূল ছুটো ঘড়ির কাঁটাই সে দেখতে পায়। পাখি, যে 'পিয়া পিউ' বলে ডাকলে, তার আর দেখা পায় না, এমনি নিত্য ঘটে বারে বারে। ঘড়ির মধ্যে যে পাখি, সে এখনো ডাকে নি, ডেকে গেল বনের পাখিটা। শুনে খাকি বললে, "আঃ, তবু ভালো, এই বেলা গিয়ে ঘুলঘুলিতে আড়াসি পেতে বসে থাকি, আজ সে পিউ-পাখির দেখা নিয়ে তবে অন্য কাজ, রোজই কি ফাঁকি দেবে।"

খাকি কেন যে ঘন ঘন ঘড়ি দেখে আসে, সফেদির কাছে আজ সেটা ধরা পড়ে গেল। খাকির মন-পাখি যে কোন্ পাখির কাছে বাঁধা পড়েছে, সবার কাছে সেই খবরটা জানিয়ে দেবার জন্যে সফেদি চলেছে, এমন সময় চালের উপর থেকে কে একজন ডাক দিলে, "সাদি, ও দিদি, ও সফেদি।" "কে রে, কে রে।"— ব'লে সাদি চারি দিক চাইতে লাগল। উত্তর হল, "আমি কবুত গো কবুত।" সফেদি রেগে বললে, "আরে তা তো জানি। কোথায় তুই ?"

"ছাতে গো ছাতে।"

সাদি দেখলে, এক গাঁ থেকে আর-এক গাঁয়ে নীল আকাশের খবর বয়ে চলে যে নীল পায়রা তারি একটা একটুখানি জিরোতে আর একটু গল্প করে নিতে কোঠাবাড়ির আলসেতে বসেছে।

গোলাবাড়ির কুঁকড়োকে একটিবার চোখে দেখতে, তার একটুখানি খবর শুনে জীবনটা সার্থক করে নিতে পায়রা অনেক দিন ধরে মনে আশা করে আসছে ; সাদা মুরগির কাছে ঠিক খবর পাবে মনে করে পায়রা তাকে শুধোতে যাবে, এমন সময় উঠোনের কোণে একটা মাসকলাই চোখে পড়তেই সাদি সেদিকে 'রও' বলেই দৌড়ে গেল। সাদিকে কলাই খুঁটতে দেখে সুরকি ছুটে এল, কালি বালি গুলজারি সবাই এসে সাদিকে ঘিরে শুধোতে লাগল, "দেখি, কী পেলি। দেখি, কী খেলি। দেখি দেখি, কী কী।" সাদি টুপ করে মাসকলাইটা গালে ভরে ফিক করে হেসে বললে, "কট্ কট্ কলাট, মা-স ক-লা-ই।" ব'লেই সাদি কোঠাবাড়ির ঘুলঘুলির ধারে যেখানে খাকি চুপটি করে বসে ছিল, সেখানে চলে গেল।

সাদি বললে, "ওলো, ঘুলঘুলিটা খোলা পেলি কি।"

খাকি সাদিকে দরমার ঝাঁপে একটা ইঁদুরের গর্ত দেখিয়ে বলছে, "যেমনি ঘণ্টা পড়বে, আর অমনি সে ওই গর্তটায় চোখ দিয়ে…"

এমন সময় পায়রা ডাক দিলে, খুব নরম করে, মিষ্টি করে, "দুধি-ভাতি সাদি সাহাজাদী, ও সফেদি।"

এবার সাদি সাড়া দিলে, "নীলের বড়ি, নীল পোখরাজ। কী বলবে বলো।"

পায়রা খুব খানিক গলা ফুলিয়ে গদগদ সুরে বললে, "যদি একবার, একটিবার, বলব তবে —শুধু একটিবার যদি দেখাও…"

খাকি, সুরকি, গুলজারি সব মুরগি ইতিমধ্যে সেখানে জুটেছিল। তারা সবাই সাদির সঙ্গে বলে উঠল, "কী, কী, কী, কী দেখাব।"

পায়রা অনেকখানি ঢোক গিলে বললে, "তাঁর মাথার মোরগফুলটি যদি একটিবার…"

সব মুরগি হেসে এ-ওর গায়ে ঢলে পড়ে বলতে লেগেছে, "চায় লা, চায় লা, দেখতে চায়, দেখতে চায়।"

পায়রা বলছে, "দেখবই দেখব, দেখবই দেখব," আর আলসের উপর গলা ফুলিয়ে দৌড়ে বেড়াচ্ছে।

সাদা মুরগি তাকে ধমকে বললে, "অত ব্যস্ত কেন। আলসেটা ভাঙবে নাকি।"

পায়রা ডানা চুলকে বললে, "না, না, তবে কিনা আমরা তাঁকে ছেরেদ্ধা করে থাকি…"

সাদি বুক ফুলিয়ে বলে উঠল, "ছেরেদ্ধা কে না করে।"

খোপ ছেড়ে আসবার সময়, কবুতনিকে সে ফিরে এসে যে জগদ্‌বিখ্যাত পাহাড়তলির কুঁকড়োর রূপ-বর্ণনা শুনিয়ে দেবে, দিব্যি করে এসেছে, সাদিকে পায়রা সে কথা বলে নিলে। সাদি ইতিমধ্যে আবার ধান খুঁটতে লেগেছিল, সে পায়রার কথার উত্তর দিলে, "চমৎকার, দেখতে চমৎকার, এ কথা সবাই বলবে।"

পায়রা বলছিল, কতদিন খোপের মধ্যে বসে তারা দুটিতে তাঁর ডাক শুনেছে, নীল আকাশ ভেদ করে আসছে, সোনার সুচের মতো ঝকঝকে সেই ডাক, আকাশ আর মাটিকে যেন বিনি সুতোর মালাখানিতে বেঁধে এক ক'রে দিয়ে।

কুঞ্জলতার আড়ালে বেড়ার গায়ে ভাঙা খাঁচায় তাল-চড়াই এদিক-ওদিক করছিল, হঠাৎ বলে উঠল, "ঠিক, ঠিক, সবারি প্রাণ তার জন্যে ছটফটায়।"

এক মুরগি বলে উঠল, "কার কথা হচ্ছে, আমাদের কুঁকড়োর নাকি।"

চড়াই বলে উঠল, "কুঁকড়ো কি শুধু তোদেরই না তোরাই শুধু তার। তুই মুই সেই, তোরা মোরা তারা, তোদের মোদের তাদের, সবাই তার, সে সবার।"

কিছু দূরে গোবদামুখো পেরু বসে বসে এই-সব কথা শুনছিল, এখন আস্তে আস্তে পায়রার কাছে এসে, কুঁকড়ো যে এল ব'লে এবং এখনি যে সে তার চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করে কুঁকড়োকে দেখে জীবন সার্থক করতে পারবে, এই কথা খুব ঘটা করে জানিয়ে দিলে। পায়রা বললে, "পেরু মশায়, আপনিও তাঁকে চেনেন ?"

পেরু গলার থলিটা দুলিয়ে বলে উঠল, "আমি চিনি নে! কুঁকড়োকে জন্মাতে দেখলেম, সেদিন!"

কুঁকড়োর জন্মস্থানটা দেখবার জন্যে পায়রা ভারি ব্যস্ত হয়ে উঠল। পেরু তাকে একটা পুরোনো বেতের পেঁটরা দেখিয়ে বললে, "এইখানে কুঁকড়োর জন্ম হয় কর্কট রাশিস্থে ভাস্করে, মুক্তোর মতো এক ডিম থেকে।" যে মুরগি এই ডিমে তা দিয়েছিলেন, তিনি এখনো বর্তমান কিনা, শুধোলে পেরু পায়রাকে বললে, "এই পেঁটরার মধ্যেই তিনি আছেন, এখন বৃদ্ধা হয়েছেন, বড়ো একটা বাইরে আসেন না, কেবলই ঝিমোচ্ছেন, কুঁকড়োর কথা হলেই যা এক-একবার চোখ মেলেন।" ব'লেই পেরু সেই পেঁটরার কাছে মুখ নিয়ে বললে, "শুনছ গিন্নি, তোমার কুঁকড়োর এখন খুব বাড়-বাড়ন্ত"—বলতেই পেঁটরার ডালা ঠেলে বুড়ি মুরগি হেঁয়ালিতে জবাব দিলে, "পুরোনো চাল ভাতে বাড়ে গো, ভাতে বাড়ে।" জবাব দিয়েই বুড়ি পেঁটরার মধ্যে মুড়িসুড়ি দিয়ে লুকিয়ে পড়ল।

পেরু বলে উঠল, "আমাদের গিন্নি হেঁয়ালি বলতে খুব মজবুত, মুখে মুখে হেঁয়ালি জুগিয়ে বলতে এঁর মতো দুজন দেখা যায় না। কলির বিষ্ণুশর্মার অবতার কিম্বা চাণক্য পণ্ডিতাও বলতে পারো।" অমনি পেঁটরার মধ্যে থেকে জবাব হল, "ময়ূর গেলেন লেজ গুড়িয়ে, পেরু ধরলেন পাখা!" "দেখলে, দেখলে" বলতে বলতে পেরু সেখান থেকে সরলেন।

পায়রা সাদা মুরগিকে শুধোলে, "শুনেছি নাকি, সুখেও যেমন দুখেও তেমনি, শীতে-বর্ষায় কালে-অকালে তাঁর গলার সুর সমান মিঠে।"

মুরগি উত্তর দিলে, "ঠিক, ঠিক।"

"শুনেছি তাঁর সাড়া পেলে শিকরে বাজ আর একদণ্ড আকাশে তিষ্ঠে থাকতে পায় না, সবার মন আপনা হতেই কাজে লাগে।"

"ঠিক, ঠিক।"

"শুনেছি, ডিমের মধ্যে যে কচি কচি পাখি তাদেরও রক্ষে করে তাঁর গান, বেজি আর ভাম বাসার দিকে মোটেই আসে না।"

অমনি চড়াই বলে উঠল, "তাওয়ায় চড়ানো ডিমসিদ্ধ খেতে।"

"ঠিক, ঠিক।"

পায়রা এবার আলসে থেকে একেবারে মুখ ঝুঁকিয়ে বললে, "আর শুনেছি নাকি তিনি কী গুণগান জানেন, যার গুণে তিনি নাম ধরে ডাক দিলেই পৃথিবীর রাঙা ফুল, তারা শুনতে পায়, আর অমনি চারি দিকে ফুটে ওঠে, রাজ্যের অশোক শিমুল পারুল পলাশ জবা লাল পারিজাত গোলাপ আর গুল্-আনার?"

"এও ঠিক সত্যি, ঠিক সত্যি।"

"আর নাকি যার গুণে এমন হয়, সে-মন্তর জগতে তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না।"

সাদা মুরগি উত্তর দিলে, "না। শুনেছি, তাঁর পিয়ারী যে পাখি, সেও জানে না, কী সে-মন্তর।"

"তাঁর পিয়ারী পাখিরা জানে না বল।"

সাদা মুরগি উত্তর করলে না।

পায়রার একটিমাত্র পিয়ারী— কপোতনী; কাজেই কুঁকড়োর অনেক পিয়ারী শুনে সে একটু চমকে গেল। চড়াই বলে উঠল, "অবাক হলে যে? কুঁকড়োর পিয়ারী অনেক হবে না তো কি তোমার হবে। তুমি তো বল কেবল ঘু ঘু, আর তিনি যে নানা ছন্দে গান করেন।"

পায়রা বললে, "কী আশ্চর্য। তাঁর সব চেয়ে পিয়ারী মুরগি, সেও জানে না তবে কী সে মহামন্ত্র।"

অমনি সুরকি খাকি রূপালি সাদি গুলজারি যে যেখানে ছিল, সবাই একসঙ্গে বলে উঠল, "না গো না, জানি না তো, জানি না তো।"

এই-সব কথা হচ্ছে, ইতিমধ্যে দেখা গেল একটি মন্নুয়া কুঞ্জলতার পাতার উপর এসে বসেছে আর একটা সরু আটাকাঠি আস্তে আস্তে মন্নুয়াটির দিকে বেড়ার ওধার থেকে এগিয়ে আসছে— কাঠির মাথায় সাপের চক্করের মতো দড়ির ফাঁস।

তাল-চড়াই মন্নুয়াটিকে দেখছে কিন্তু সেই একটুখানি মন্নুয়াকে ধরবার জন্যে অত বড়ো ফাঁস-লাগানো আটাকাঠিটা যে এগিয়ে আসছে, সেটা তার চোখে পড়ে নি। সে আপনার মনেই বকে যাচ্ছে, "মন-মন্নুয়া, বনের টিয়া।" হঠাৎ দূর থেকে কুঁকড়োর সাড়া এল, খবর-দারি···। অমনি চমকে উঠে মন্নুয়া-পাখি ডানা মেলে উড়ে পালাল, আটাকাঠিটা সাঁ করে একবার আকাশ আঁচড়ে বেড়ার ওধারে আস্তে আস্তে লুকিয়ে পড়ল।

চড়াইটা অমনি ব্যঙ্গ করে বলে উঠল, "দেখলে কুঁকড়োর কীর্তি। এইবার কর্তা আসছেন।"

কুঁকড়ো আসছেন শুনে সবাই শশব্যস্ত। পায়রা এদিক-ওদিক ঘাড় ফিরিয়ে দেখছে, তাল-চড়াই সেটা সইতে না পেরে বললে, "এমনি কী অদ্ভুত কুঁকড়োর চেহারাখানা। পাকা ফুটিতে দুটি শজনেখাড়া গুঁজে দাও, মাথার দিকে একটা বিটপালং কিম্বা কতকটা লাল পুঁইশাক, চোখের জায়গায় দুটো পাকা কুল, কানের কাছে ঝোলাও লাল দুটো পুলি-বেগুন, লেজের দিকে বেঁধে দাও আনারসের মুকুটি— বস্, জলজ্যান্ত কুঁকড়োটা গড়ে ফেলো।"

পেরু এই কুঁকড়োর রূপ-বর্ণনা খুব মন দিয়ে শুনছিল, আর তাল-চড়াইয়ের বুদ্ধির তারিফ করছিল। পায়রা গলা ফুলিয়ে বললে, "চড়াই ভায়া, তোমার কুঁকড়ো যে সাড়া দেয় না, দেখি।" চড়াই বললে, "ওই ডাকটুকু ছাড়া আর সবখানি ঠিক কুঁকড়ো হয়েছে, না?"

পায়রা রেগে গলা ফুলিয়ে বলে উঠল, "বোকো না, বোকো না, মোটে না, মোটে না, বোকো না।" ঠিক সেই সময় বেড়ার উপরে ঝুপ করে এসে কুঁকড়ো বসলেন। পায়রা দেখলে মানিকের মুকুট আর সোনার বুক-পাটায় সেজে যেন এক বীরপুরুষ এসে সামনে দাঁড়িয়েছেন। সন্ধ্যার আলো তাঁর সকল গায়ে পলকে পলকে রামধনুকের রঙ ধ'রে ঝিকমিক ঝিকমিক করছে, দৃষ্টি তাঁর আকাশের দিকে স্থির। মিষ্টি মধুর সুরে তিনি ডাকলেন,

"আ-লো। আ-লো। আ-লো।" তার পর তাঁর বুকের মধ্যে থেকে যেন সুর উঠল, "অতু-ল ফু-উ-ল। আলোর ফুল! আলো— প্রাণের ফুলকি আলো, চোখের দৃষ্টি আলো, এসো ফুলের উপর দিয়ে, শিশির মুছে দিয়ে, এসো পাতায়-লতায় ফুলে ঝিক্‌মিক। আলোতে ঝিক্‌মিক— দেখা দিক, সব দেখা দিক, ভিতরে যাক তোমার প্রভা, বাইরে থাক্ তোমার আভা, একই আলো ঘিরে থাক্ শত দিক শতধারে, অনেক আলোর এক আলো, অনেক ছেলের এক মা। তোমার স্তুতি গাই আলোকবাদিন, আলোকের স্তোতা। তোমায় দেখি ছোটো হতে ছোটো, বড়ো হতে বড়ো, নানাতে, নানা কালে— কাচে, মানিকে, মাটিতে, আকাশে, জলে-স্থলে; সকালে জ্বলজ্বল, সন্ধ্যায় ঝিলমিল, মন্দিরে, কুটিরে, পথে বিপথে। ভিখারীর কাঁথার শোভা, রাজার পতাকায় প্রভা— আলো। বনের তলায় সোনার লেখা, সবুজ ঘাসে সোনার চুমকি, আলোর ফুলকি, আলপনা অ-তু-উ-ল অমূল আলো।"

আর-সব পাখি যে-যার কাজে ব্যস্ত ছিল, কেউ ধান খুঁটছিল কেউ গা ঝাড়ছিল, গুলজারি করছিল কিচমিচ, সুরকি মাখছিল ধুলো, খাকি ঘাঁটছিল ছাইপাঁশ, কালি খুঁড়ছিল গর্ত, সাদি মাজছিল গা, পেরু বকছিল বকবক, চড়াই বলছিল ছি-ছি, কেবল সেই আকাশের মতো নীল পায়রা অবাক হয়ে শুনছিল—

জয় জয় আলোর জয়।

পায়রা আর স্থির থাকতে পারলে না, গলা কাঁপিয়ে দুই ডানা ঝটপট করে বলে উঠল, "সাধু সাধু।" কুঁকড়ো আঙিনায় নেমে পায়রাকে দেখে বললেন, "ধন্যবাদ হে অচেনা পাখি, এখনি কি যাওয়া হবে।"

পায়রা বললে, "আপনার দর্শন পেয়ে কৃতার্থ হয়েছি, এখন ঘরে গিয়ে কপোতীকে আপনার আশীর্বাদ দিয়ে চরিতার্থ হই।" কপোতনীর প্রবালের মতো রাঙা পায়ে নমস্কার জানিয়ে কুঁকড়ো কবুতকে বিদায় করলেন। পায়রা তাল-চড়াইয়ের ভাঙা খাঁচায় ডানার এক ঝাপটা মেরে গাঁয়ের দিকে উড়ে গেল।

চড়াইটা গজগজ করতে লাগল, "সুঁড়ির জয় মাতালে কয়।" কুঁকড়ো ডাক দিলেন, "কাজ ভুলো না, কাজ ভুলো না।" আর অমনি রাজহাঁস সে আর চুপচাপ বসে রইল না,

পাতিহাঁস, চিনেহাঁস, সব হাঁসগুলোকে দিঘির পাড়ে জল খাইয়ে আনতে চলল। কুঁকড়ো হুকুম দিলেন, যত কুঁড়ে হাঁসের ছানা সবাইকে বেলা পড়বার আগে অন্তত বত্রিশটা করে গুগলি সংগ্রহ করে আনা চাই। একটা বাচ্চা মোরগ, তাকে পাঠালেন কুঁকড়ো বেড়ার উপর দাঁড়িয়ে চারশো'বার 'ককুর-কু' বলে গলা সাধতে, এমন চড়া সুরে, যেন ওদিকের পাহাড়ে ঠেকে তার গলার আওয়াজ এদিকের বনে এসে পরিষ্কার পৌঁছয়।

বাচ্চা মোরগ গলা সাধতে একটু ইতস্তত করছে দেখে কুঁকড়ো তাকে আস্তে এক ঠোকর দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন যে, তার বয়েসে তাঁকেও প্রতিদিন ঠিক এমনি করেই গলা সাধতে আর পড়া মুখস্থ কণ্ঠস্থ সবি করতে হয়েছে। বাচ্চা মোরগের মা গুলজারি ছেলের হয়ে কুঁকড়োর সঙ্গে একটু কোঁদল করবার চেষ্টা করতেই, "যাও, জালার মধ্যে ডিমগুলোতে তা দাও সারারাত।"— গুলজারির উপর এই হুকুম-জারি করে আর-সব মুরগিদের সবজি বাগানে যে-সব পোকা শাক-পাতা কেটে নষ্ট করছে, তার সব কটিকে বেছে সাফ করতে পাঠিয়ে দিয়ে কুঁকড়ো পেঁটরার মধ্যে তাঁর মায়ের কাছে উপস্থিত। কুঁকড়োর মা তাঁকে ধমকে বলে উঠল, "এইটুকু বয়েসে তোর এই বিদ্যে হচ্ছে। কেবল টো টো করে ঘুরে বেড়ানো।" কুঁকড়ো একটু হেসে বললেন, "মা, আমি যে এখন মস্ত এক কুঁকড়ো হয়ে উঠেছি।" "যাঃ, যাঃ, বকিস নে। 'বেঙাচি বলাতে চান তিনি কোলা ব্যাং, ওরে বাপু সময়েতে সব হয়, চিল হন চ্যাং।' আজ না হয় হবে কাল।" বলেই কুঁকড়োর মা পেঁটরার ডালাটা বন্ধ করলেন।

সাদি, কালি, সুরকি, খাকি কুঁকড়োর মার চার বউ। কুঁকড়ো আসতেই তারা বলে উঠল, "ঘরে কুঁড়োটি নেই যে, তার কী করছ।" "চরে খাওগে" বলেই কুঁকড়ো গা-ঝাড়া দিয়ে বসলেন। একদল বসে-বসে খাবে আর পরচর্চা করবে, আর অন্যদল তাদের খোরাক জোগাবার জন্যে খেটে মরবে, কুঁকড়োর পরিবারে সেটি হবার জো নেই, তা তুমি উপোসই কর, আর না-খেয়েই মর। কাজেই কালি সাদি সবাই যেখানে যা পায়, হুমুঠো খেয়ে নিতে চলল। কিন্তু খাকি— সে নড়তে চায় না, সাদিকে চুপিচুপি বললে, "তোরা যা না, আমি সেই ঘড়ির মধ্যেকার পিউ-পাখির সন্ধানে রইলেম।" বলে খাকি একটা ঝাঁপির আড়ালে লুকোল। আর-সব মুরগি গেছে, কেবল সুরকি বসে-বসে নখে মাটি খুঁড়ছে মুখ ভার করে, দেখে কুঁকড়ো

শুধোলেন, "তোর আজ হল কী।"

সুরকি ভয়ে ভয়ে ঢোক গিলে বললে, "কুঁ-ক বলি—"

কুঁকড়ো গম্ভীর মুখে বললেন, "বলেই ফেল্ না। বনিতার ভনিতার কবিতার কোন্‌টা বাকি?" উত্তর হল, "বল তো ভালোবাস, কিন্তু—"

"কথাটা চেপে যাও ছোটো বউ, চেপে যাও।" কুঁকড়ো উত্তর করলেন।

ছোটো বউ ছাড়বার পাত্রী নয়, কান্না ধরলে, "না আমি শুনবই।" কুঁকড়ো বিরক্ত হয়ে বলে উঠলেন, "আর ছাই শুনবে কি-ই-ই।" কুঁকড়োকে সুরকি একলা পেয়ে কিছু মতলব হাসিলের চেষ্টায় আছে সব মুরগিই সেটা এঁচেছিল। তারা খাবারের চেষ্টায় কেউ যায় নি। এখন সাদি এক-কোণ থেকে আস্তে আস্তে বেরিয়ে এসে বললে, "তোমার পাটরানী আমি, সাদি।" কুঁকড়ো বিষম গম্ভীর হয়ে বললেন, "কে বললে— না।" সাদি একটু গলা চড়িয়ে বললে, "আমায় বলতেই হবে।" ইতিমধ্যে এক দিক থেকে কালি এসে বলছে, খুব বিনিয়ে বিনিয়ে, "কও, আমি তোমার সু-ও-রা-নী।" কুঁকড়ো ঠিক তেমনি সুরে উত্তর করলেন, "কি— না— বল— গা।" কালি সুর ধরলে "বল না, বল না…" অমনি সাদি বলে উঠল, "মন্তরটা কী? যার গুণে তুমি গুণীর মতো গান গাও?" কাছে ঘেঁষে সুরকিও সুর ধরলেন, "হ্যাঁগা, শুনেছি তোমার গলার মধ্যে একটা পিতলের রামশিঙে পরানো আছে, আর তাতেই নাকি লোকে তোমার নাম দিয়েছে আম-পাখি।"

কুঁকড়ো ব্যাপার বুঝে খুব খানিকটা হেসে মাথা হেলিয়ে বললেন, "আছে তো আছে। এই গলার একেবারে টুঁটির ঠিক মাঝখানে খুব শক্ত জায়গায় সেটা লুকোনো আছে, খুঁজে পাওয়া শক্ত।" বীজমন্তরটা মুরগিদের কানে দেবার জন্যে কুঁকড়ো মোটেই ব্যস্ত ছিলেন না, তবু খুব চুপিচুপি তাদের প্রত্যেকের কানের কাছে মুখ নিয়ে নিয়ে বললেন, "দেখো, মাঠের মধ্যে যখন চরতে যাচ্ছ, তখন খবরদার ঘাসের ফুল মাড়িয়ো না, ফুলের পোকা খেয়ো কিন্তু ফুল যেন ঠিক থাকে। খবরদার, যা-ও।"

মুরগিরা চলে যাচ্ছিল, কুঁকড়ো তাদের ডেকে বললেন, "জানো, যখন যাবে চরতে—"

এক মুরগি পাঠ বললে, "বাগিচায়"। কুঁকড়ো বললেন, "পয়লা মুরগি—" ইস্কুলের

মেয়েদের মতো সব মুরগি একসঙ্গে বলে উঠল, "আগে যায়।" কুঁকড়ো হুকুম দিলেন, "যা—ও।" মুরগিরা যাচ্ছিল, কুঁকড়ো তাড়াতাড়ি তাদের ডেকে সাবধান করে দিলেন, "সড়ক পার হবার সময় রাস্তায় কী আছে, তা খুঁটে নেবার চেষ্টা করা ভুল, গাড়িচাপা পড়তে পার।"

মুরগিরা ভালোমানুষের মতো বেড়ার ফাঁকটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। কুঁকড়ো চারি দিক দেখে বললেন, "দুই তিন চার, সিধে হও পার।" ঠিক সেই সময় দূরে মটরগাড়ির ভেঁপু বাজল, "হাউ মাউ— খাউ।" কুঁকড়োর অমনি সাড়া পড়ল— ভেঁপুর চেয়ে জোর আওয়াজ— 'স বু-উ-উ-র।' বেড়ার ধার দিয়ে সাঁ-করে খানিক ধুলো আর ধোঁয়া গড়াতে গড়াতে চলে গেল। মিনিট কতক পরে যখন সব পরিষ্কার হল, তখন কুঁকড়ো মুরগিদের যাবার পথ ছেড়ে একপাশে সরে দাঁড়ালেন। একে একে মুরগিরা চলল, সাদি খাকি গুলজারি। সুরকি সব-শেষে। সে কুঁকড়োকে বলে গেল, "কাব্যাৎ, যা-খাই তাতেই আজ তেল-তেল গন্ধ করছে, যেন তেলাকুচোর তেলফুলুরি।" ঝাঁপির আড়ালে খাকি মুরগি, সে মনে মনে বললে, 'রক্ষে, তিনি আমাকে দেখেন নি, বাঁচলেম বাপু।'

২

সাদি, কালি, গুলজারি— এরা সবাই সেটা জানবার জন্যে ধরাধরি করছে। পায়রা থেকে চড়াই এমন-কি, টিকটিকি পর্যন্ত পাহাড়তলির এ-পাড়া ও-পাড়ার ছেলেবুড়ো যে যেখানে আছে, সবাই যে লুকোনো জিনিসের কথা বলাবলি করছে, কুঁকড়ো সেই লুকোনো জিনিসের খবরটা বুকের মধ্যে নিয়ে বসে আছেন; কিন্তু মুখ ফুটে কাউকে বলতে পারেন না, অথচ না বললেও বুক যে ফেটে যায়। অতি গোপনীয় বীজমন্ত্রটি যার কানে চুপিচুপি বলে দেওয়া চলে, এমন উপযুক্ত পাত্র— সে কোথা। এ যে অতি গোপন কথা, অতি নিগূঢ় রহস্য। মেয়েরা তো এ কথা একটি দিন চেপে রাখতে পারবে না। বিশেষত সাদি কালি সুরকি আর খাকি এমনি সব গুলবাহারি গুলজারি, যাঁদের মুখ চলছেই, তাঁদের এ কথা একেবারেই বলা যেতে পারে না, শোনবার জন্যে তাঁরা যতই ইচ্ছুক থাকুক-না কেন। নাঃ, বুক ফেটে

যায় যাক, মনের কথা মনেই থাক্, গুপ্ত মন্তর, অন্তরের ভাবনা মন থেকে দূর করে যেমন আর সবাই, তেমনি আমিই বা কেন না থাকি— দিব্যি আরামে, পাহাড়তলির রাজবাহাদুর কুঁকড়ো। এইটুকুই যথেষ্ট, আর এইটুকুতেই আমার আনন্দ, কিমধিকমিতি। মনে মনে এই তর্কবিতর্ক করতে করতে বুক ফুলিয়ে কুঁকড়ো ধানের মরাইটার চার দিকে পা-চালি করছেন, আর এক-একবার নিজের দিকে ঘাড় বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে নিজেকে নিজে তারিফ করছেন, 'ক্যা খপ্‌-সু র তি ই-ই'। তাঁর মাথার মোরগফুলটা আর চোখের কোল থেকে ঝুলছে যে দাড়ি, তার মেহেদি রঙটা যে বনের টিয়া থেকে আরম্ভ করে লাল তুতির লালকেও হার মানিয়েছে, এটা কুঁকড়োকে আর বুঝিয়ে দিতে হল না। তিনি খড়ের গাদার উপরে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে আকাশের পানে একবার, মাঠের দিকে একবার, তাকিয়ে দেখলেন ; সোনা আর মানিকের আভায় জল স্থল আকাশ রাঙিয়ে সন্ধ্যাটি কী চমৎকার সাজেই সেজে এসেছে। "আজকের মতো দিনের শেষ কাজ সাঁঝি-আলপনা দেওয়া হল, আজ করবার যা, তা সারা হয়েছে, কালকের চিন্তা কাল হবে, এখন আর কী, দুমুঠো যা জোটে, খেয়ে নিতে ছু-টি-ই-ই।" বলেই কুঁকড়ো একটিবার ডাক দিয়ে চালাঘরের মটকা থেকে নেমে বাসার দিকে দৌড়ে যাবেন, ওদিক থেকে শব্দ এল, 'রও-ও-ও'! উঠানের মধ্যে শুকনো ঘাসের বোঝাটা একবার খসখস করে উঠল, আর তার তলা থেকে জিম্মা কুত্তানী খড় আর কুটোয় ঝাঁকড়া মাথাটা বের করে জুলজুল করে কুঁকড়োর দিকে চাইতে লাগল।

কুঁকড়ো আর কুকুরের চেহারায় মিল না হলেও নামে নামে যেমন কতকটা, কাজেও তেমনি অনেকটা মিল ছিল। দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন দুজনেরই জীবনের ব্রত। কাজেই দুজনে যে ভাব খুবই হবে, তার আশ্চর্য কী। তা ছাড়া সূর্য আর মাটি দুয়েরই পরশ দুজনেরই ভালো লাগে। এই আকাশের আলো আর পৃথিবীর উপর ভালোবাসা এই দুটি জীবকে যেন একসূত্রে বেঁধেছে। সূর্যের দিকে মুখ করে মাটির কোলে দুই পা রেখে না দাঁড়ালে কুঁকড়োর গান মোটেই খোলে না ; আর কুকুর তার আনন্দই হয় না, রোদে মাটির উপরে এক-একবার না গড়িয়ে নিলে। জিম্মা প্রায়ই বলে, "সূর্যকে ভালোবাসে বলেই না সে চাঁদ দেখলেই তাড়া করে যায়, আর মাটিকে ভালোবাসে বলেই না সে গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে

মুখটি দিয়ে চুপটি করে থাকে।" ভালোবাসার বশে জিম্মা বাড়ির বাগানটায় এত গর্ত করে রাখত যে এক-একদিন বুড়ো ভাগবত মালি কর্তার কাছে কুকুরের নামে নালিশ জুড়ত। কিন্তু জিম্মার সব দোষ মাপ ছিল, গোলাবাড়ির সব জানোয়ারের খবরদারি, ক্ষেতে না গোরুবাছুর ঢোকে তার দিকে নজর রাখা, এমনি সব পাহারার কাজে জিম্মার মতো আর তো দুটি ছিল না। তা ছাড়া জিম্মার জিম্মায় অমন যে কুঁকড়ো এমন-কি, তাঁর অত্যাশ্চর্য সুরটি পর্যন্ত রাত্রে না রাখলে চলে না; কাজেই কুকুর হঠাৎ যখন বললে, 'রও' তখন যে একটা বিপদের সম্ভাবনা আছে, সেটা জানা গেল। কিন্তু এমন কী বিপদ হতে পারে। কুঁকড়ো দেখলেন, অন্যদিন যেমন আজও সন্ধ্যাবেলা ঠিক তেমনি চারি দিক নিরাপদ বোধ হচ্ছে, অন্তত তাঁর এই গোলাবাড়ির রাজত্বের বেড়ার মধ্যে কোনো যে শত্রু আছে, তা তো কিছুতেই মনে হয় না। সে যে মিছে ভয় পাচ্ছে সেটা তিনি জিম্মাকে বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করলেন। ভয় কাকে বলে কুকুরের জানা ছিল না; কিন্তু মিথ্যুক আর মিছে নিন্দে রটাতে গোলাবাড়িতে আর পাড়াপড়শীর ঘরেতে যারা, তাদের সে ভালোরকমই জানত। কুঁকড়ো না জানলেও ঐ বোঁচা-ঠোঁট চড়াই আর ডিগডিগে-পা ময়ুর যে কুঁকড়োর দুই প্রধান শত্রু, সেটা জিম্মা কুঁকড়োকে জানিয়ে দিতে বিলম্ব করলে না। তালচড়াই, যার নিজের কোনো আওয়াজ নেই, হরবোলার মতো পরের জিনিস নকল করেই চুলবুল করে বেড়ায়, পরের ধনে পোদ্দারি যার পেশা, আর ঐ ময়ুর, জরি-জরাবৎ আর হীরে-মানিকের ঝকমকানি ছাড়া আর-কোনো আলো যার ভিতরে বাহিরে কোথাও নেই, দরজি আর জহুরির দোকানের নমুনো-ঝোলাবার আলনা ছাড়া আর কিছুই যাকে বলা যায় না, এই অদ্ভুত জানোয়ার তাঁর প্রধান শত্রু শুনে কুঁকড়ো একেবারে 'হাঃ হাঃ' করে হেসে উঠলেন। জিম্মা বললে, "কারো সঙ্গে খোলাখুলি শত্রুতা করবার সাহস আর ক্ষমতা না থাকলেও এরা সবাইকে হেয় মনে করে, এমন-কি, কুঁকড়োর নিন্দেও সুবিধা বুঝে করতে ছাড়ে না। এবং খাওয়া-পরা-সাজগোজের দিক দিয়েও এরা পাড়ার মধ্যে নানা বদ চাল ঢোকাচ্ছে। এদের দেখাদেখি অন্যেরাও বেয়াড়া বেচাল বে-আদব হয়ে ওঠবার জোগাড়ে আছে। সাদাসিধেভাবে খেটেখুটে পাড়াপড়শীকে ভালোবেসে আনন্দে থাকতে চায় যে-সব জীব, তাদের এই-সব

সাজানো পাখিরা বলে, 'ছা-পোষার' দল। আর নিষ্কর্মা বসে-থাকা পালকের গদিতে কিম্বা মাথায় পালক গুঁজে হাওয়া খেয়ে ঘুরঘুর করাকেই এরা বলে চাল। সেটা রাখতে চালের সব খড় উড়ে গেলেও এরা নিজের বুদ্ধির প্রশংসা নিজেরাই করে থাকে, আর অনেক সুবুদ্ধি পাখির মাথা ঘুরিয়ে দেয় দুর্বুদ্ধি এই দুই অদ্ভুত জানোয়ার, কথা-সর্বস্ব হরবোলা আর পাখা-সর্বস্ব চালচিত্র।"

কুঁকড়ো কাজে যেমন দড়ো, বুদ্ধিতে তেমনি ; চড়াই আর ময়ূরের চেয়ে অনেক বড়ো, দিলদরিয়া, কাজেই পৃথিবীতে অন্তত এই গোলাবাড়িতে যে তাঁর কেউ গোপনে সর্বনাশের চেষ্টায় আছে, এটা বিশ্বাস করা কুঁকড়োর পক্ষে শক্ত। তিনি বললেন, "জিম্মা নিশ্চয়ই একটু বাড়িয়ে বলছে, অন্যের সামান্য দোষকে সে এত যে বড়ো করে দেখছে, সে কেবল তাঁকে সে খুবই ভালোবাসে বলে। চড়াই হল তাঁর ছেলেবেলার বন্ধু আর ময়ূরটা লোক তো খুব মন্দ নয়। আর যদিই বা তাঁর শত্রু সবাই হয়, তাতেই বা ক্ষতি কী। তিনি তাঁর গান এবং মুরগিদের ভালোবাসা পেয়েই তো সুখী, নেইবা আর কিছু থাকল।"

জিম্মা অনেকদিন এই গোলাবাড়িটায় রয়েছে, এখানকার কে যে কেমন, তা জানতে তার বাকি ছিল না। কুঁকড়োর উপরে মুরগিদেরও যে খুব টান নেই, তারও প্রমাণ অনেকবার পাওয়া গেছে। "বিশ্বাস কাউকে নেই।" বলেই জিম্মা এমনি এক হুংকার ছাড়ল যে পাঁচিলের গায়ে চড়াই পাখির খাঁচাটা পর্যন্ত কেঁপে উঠল। "ব্যাপার কী!" বলে চড়াই কুঞ্জলতার মাচা বেয়ে নীচে উপস্থিত। জিম্মা চড়াইকে সাফ জবাব দেবার জন্যে চেপে ধরলে। আড়ালে একরকম আর কুঁকড়োর সামনে অন্যরকম ভাব দেখানো আর চলছে না। বলুক সে-চড়াইটা সত্যিই কুঁকড়োকে পছন্দ করে কি না, না হলে আজ আর ছাড়ান নেই। চড়াই মনে মনে বিপদ গুনলে। কিন্তু কথায় তার কাছে পারবার জো নেই। সে অতি ভালোমানুষটির মতো উত্তর করলে, "কুঁকড়োকেও টুকরো-টুকরো ক'রে দেখলে বাস্তবিকই আমার হাসি পায় ; আর তার খুঁটিনাটি এটি-ওটি নিয়েই আমি তামাশা করে থাকি। কিন্তু সবখানা জড়িয়ে দেখলে কুঁকড়োকে আমার শ্রদ্ধাই হয় বলতে হবে। শুধু তাই নয়, কুঁকড়োর খুঁটিনাটি নিয়ে আমি যে ঠাট্টা-তামাশাগুলো করে থাকি, সেগুলো সবাই যে অপছন্দ করে

না, সে তো তুমিও জানো জিম্মা।”

জিম্মা ভারি বিরক্ত হয়ে বলে উঠল, “শোনো একবার, কথার ভাঁওরাটা শোনো। বাইরের বনে সোনার আলো, ফুলের মধু থাকতে যে পাখিটা দরজা-ভাঙা খাঁচায় বসে বাসি ছাতু খেয়ে পেট ভরাচ্ছে, তার কাছে পরিষ্কার জবাব আশা করাই ভুল।”

চড়াই বলে উঠল, “সাধ করে কি আমি খাঁচায় বাসা বেঁধেছি। বাইরে সোনার আলো আর সোনালি মধু সময়ে সময়ে যে সীসের গরম-গরম ছররা গুলি হয়ে দেখা দেয় দিদি।”

জিম্মা ভারি চটেছিল। উত্তর করলে, “আরে মুখখু, কোন্‌দিন কবে একটা-আধটা কার্তুজের খোলা ঢেলার মতো খুরে লাগল বলে বনের হরিণ সে কি কোনোদিন বনের থেকে তফাত থাকতে চায়, না আকাশে বাজ আছে বলে কেউ আকাশের আলোটা আর আকাশে ওড়াটা অপছন্দ করে। ভাঙা খাঁচার পুষ্যিপুত্তর হরবোলা। ফুলে-ফলে আলোতে-ছায়ায় অতি চমৎকার বনে-উপবনে যে মুক্তি, তুই তার কী বুঝবি।”

চড়াই উত্তর দিলে, “বেঁচে থাক্ আমার ভাঙা খাঁচার দাঁড়খানি। কাজ নেই আমার মুক্তিতে। রাজার হালে আছি, পরিষ্কার কলের জল খাচ্ছি, মস্ত সাবানদানিতে দুবেলা গরমের দিনে নাইতে পাচ্ছি, দোলনা চৌকি, চানের টব বনে এ-সব পাই কোথা, বলো তো দিদি।”

জিম্মা এমন রেগেছিল যে, গলার শিকলিটা খোলা পেলে সে আজ চড়াইটার গায়ের একটি পালকও রাখত না, মেরেই ফেলত।

এই ব্যাপার হচ্ছে, এমন সময় বাড়ির মধ্যে ঘড়ি বাজল, ‘পি-উ’।

যেমন ‘পিউ’ বলা, অমনি খাকি মুরগি ঝুড়ির আড়াল থেকে বেরিয়ে সেদিকে দৌড়। গর্তের মধ্যে মুখ দিয়ে সে কিন্তু কিছুই দেখতে পেলে না; এবারও তার আশা পুরল না, সময় উতরে গেছে, পিউ-পাখি পালিয়েছে।

চড়াই খাকিকে বললে, “কী দেখছ গো। এক-পহরের ঘড়ি পড়ল নাকি।”

কুঁকড়ো খাকিকে গোলাবাড়িতে দেখে অবাক হয়ে বললেন, “তুই যে চরতে যাস নি?”

খাকি চমকে উঠে ঘাড় ফিরিয়ে ডানার ঘোমটায় মুখ ঝাঁপলে।

কুঁকড়ো শুধোলেন, “গর্তটার মধ্যে মুখ গুঁজড়ে হচ্ছিল কী, শুনি।”

খাকি আমতা-আমতা করে বললে, "এই চোখ আর ঘাড়টা টনটন করছিল—"

"কাকে দেখবার জন্যে।" কুঁকড়ো শুধোলেন। খাকি বললে, "কাকে আবার।" কুঁকড়ো বললেন, "হাঁ, শুনি, কাকে।"

খাকি কান্নার সুর ধরলে, "তুমি বল কি গো।" কুঁকড়ো ধমকে বললেন, "চোপরাও, সত্যি কথা বল্।" খাকি বিনিয়ে-বিনিয়ে বললে, "পিউ পাখিকে।"

কুঁকড়ো খাকির দিক থেকে একেবারে মুখ ফেরালেন, খাকি আস্তে আস্তে পগার পারে দৌড় দিলে।

কুঁকড়ো কুকুরকে বললেন, "একটা ঘড়িকে ভালোবাসা, এমন তো কোথাও শুনি নি। এ বুদ্ধি খাকিকে দিলে কে বলো তো।"

"ওই ছিটের মেরজাই-পরা চিনে মুরগিটার কাজ।" কুকুর উত্তর দিলে।

কুঁকড়ো শুধোলেন, "কোন্ মুরগিটি, বলো তো। ওই যেটা বুড়ো বয়েসে ঠোঁটে আলতা দিয়ে বেড়ায় সেইটে নাকি।"

কুকুর উত্তর করলে, "হাঁ হাঁ, সেই বটে। তিনি যে আবার সবাইকে বৈকালি পার্টি দিচ্ছেন।"

"কোথায় সেটা হচ্ছে।" কুঁকড়ো শুধোলেন।

চড়াই উত্তর দিলে, "ওই কুল গাছটার তলায় যেখানে পাখি তাড়াবার জন্যে একটা খড়ের সাহেবি কাপড়-পরা কুশোপুতুলের কাঠামো মালী খাড়া করে রেখেছে, সেইখানে। খুব বাছা-বাছা নামজাদা পাখিরাই আজ যাবেন। কাঠামোর ভয়ে ছোটোখাটো পাখিরা সেদিকে এগোতেই সাহস পাবে না।"

কুঁকড়ো আশ্চর্য হয়ে বললেন, "বল কি, চিনে মুরগির বৈকালি!"

চড়াই ঠিক তেমনি সুরে উত্তর দিলে, "হাঁ মশায়, প্রতি সোমবার পাঁচ হইতে ছয় ঘটিকা পর্যন্ত মুরগি-গিন্নির ঘোরো মজলিস হইয়া থাকে।"

"তা হলে আজ বৈকালে—" কুঁকড়ো আরো কী শুধোতে যাচ্ছিলেন, চড়াই বলে উঠল, "না, আজ ভোরবেলায়।"

"ভোরবেলায় বৈকালি তো কখনো শুনি নি হে।" কুঁকড়ো আশ্চর্য খুবই হলেন। চড়াই

তখন কুঁকড়োকে বুঝিয়ে দিলেন, "ভোর পাঁচটায় বাগানে মালী তো থাকে না, তাই বিকেল ৫টা না করে সকাল ৫টাই ঠিক হয়েছে।"

"এ কী বিপরীত কাণ্ড।" বলে কুঁকড়ো 'হো হো' করে হেসে উঠলেন। চড়াই অমনি বলে উঠল, "বিপরীত বলে বিপরীত।" জিম্মা তাকে ধমকে বললে, "তোমার আর খোশামুদিতে কাজ নেই, তুমি নিজে তো কোনো সোমবারে পার্টিগুলো কামাই দাও না দেখি।"

চড়াই উত্তর করলে, "সত্যি যাই বটে, সবাই আমাকে খাতির করে কিনা।"

জিম্মা গজগজ করে খানিক কী বকে গেল। জিম্মা কী বকছে শুধোলে কুঁকড়োকে সে জবাব দিলে, "কোন্‌দিন হয়তো তোমাকেও কোন্-এক মুরগি এই পার্টিতে নিয়ে হাজির করেছে, দেখব।"

কুঁকড়ো হেসে বললেন, "আমাকে হাজির করে দেবে, চা-পার্টিতে, কোনো এক মুরগি!"

জিম্মা বললে, "হাঁ মশায়, এমনি হাজির করা নয়, মাথার ঝুঁটিটি ধরে টানতে টানতে না হাজির করে।"

কুঁকড়ো একটু চটেই জিম্মাকে বললেন, "এ সন্দেহটা তোমার করবার কারণটি কী।"

জিম্মা জবাব দিলে, "কারণ নতুন মুরগির দেখা পেলে মশায়ের মাথা সহজেই ঘুরে যায় এখনো।"

চড়াই বলে উঠল, "জিম্মা-দি ঠিক বলেছে, নতুন মুরগি যেমন দেখা, অমনি কুঁকড়ো-মশায় এমনি করে ঘাড় বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে 'কুক কুক' বলে নৃত্য করতে থাকেন, মুরগিটির চারি দিকে।" বলে চড়াইটা একবার কুঁকড়োর চলনবলন হুবহু দেখিয়ে দিলে।

কুঁকড়ো হেসে বললেন, "আচ্ছা বেকুফ পাখি যাহোক।"

চড়াইটা তখনো ডানা কাঁপিয়ে লেজ ছুলিয়ে কুঁকড়োর মতো তালে তালে পা ফেলে মোরগ মুরগির নকল দেখাচ্ছে, ঠিক সেই সময় ওদিকে ছুম করে বন্দুকের আওয়াজ হল। চড়াই অমনি কাঠের পুতুলের মতো এক পা তুলেই দাঁড়িয়ে গেল। কুঁকড়ো গলা উঁচু ক'রে, আর কুকুর কান খাড়া ক'রে নাক ফুলিয়ে শুনতে লাগল। আর-এক গুলির আওয়াজ। চড়াইটা গিয়ে মুরগি-গিন্নির ভাঙা পেঁটিরার আড়ালে লুকিয়েছে, এমন সময় উহু-উ-উ-উ বলতে

বলতে সোনার টোপর সোনালিয়া বন-মুরগি কুঞ্জলতার বেড়ার ওপার থেকে ঝপাং করে উড়ে এসে উঠোনের মধ্যে পড়ল।

কুঁকড়ো বলে উঠলেন, "একী। এ কে। কে এ।"

সোনালিয়া কুঁকড়োর কাছে ছুটে গিয়ে বললে, "পাহাড়তলির 'সা মোরগ', আপনি আমায় রক্ষে করুন।" আবার দুম করে আওয়াজ। সোনালিয়া চমকে উঠেই অজ্ঞান হয়ে ঢলে পড়লেন, পালাবার আর শক্তিই ছিল না। কুঁকড়ো অমনি একখানি ডানা বাড়িয়ে সোনালিয়াকে তুলে ধরে আর-এক ডানার ঝাপটা দিয়ে গামলা থেকে জলের ছিটে আর বাতাস দিতে থাকলেন খুব আস্তে আস্তে। তাঁর ভয় হচ্ছিল পাছে পাতার সবুজ, ফুলের গোলাপি, সোনার জল আর সন্ধ্যাবেলার আলো দিয়ে গড়া বাসন্তী শাড়িপরা এই আশ্চর্য পাখিটি জল পেয়ে গলে যায়, কি বাতাসে মিলিয়ে যায়। একটু চেতন পেয়ে সোনালিয়া আবার কুঁকড়োকে মিনতি করতে লাগল, "ওগো একটু আমায় লুকোবার স্থান দাও, আমাকে পেলে তারা মেরেই ফেলবে।"

চড়াই সোনালিয়ার গায়ে টকটকে লাল সাটিনের কাঁচুলি দেখে বললে, "এতখানি লালের উপর থেকে শিকারীর বন্দুকের তাগ কেমন করে যে ফসকাল, তাই ভাবছি।"

সোনালিয়া বললে, "সাধে কি গুলি ফসকেছে, চোখে যে তাদের ধাঁধা লেগে গেল। তারা মনে করেছিল, ঝোপের মধ্যে থেকে ছাই রঙের একটা তিতির-মিতির কেউ বার হবে, কিন্তু আমি সোনালি যখন হঠাৎ বেরিয়ে গেলুম সামনে দিয়ে তখন শিকারী দেখলে খানিক সোনার ঝলকা, আর আমি দেখলেম একটা আগুনের হলকা। গুলি যে কোন্‌দিকে বেরিয়ে গেল কে তা দেখবে। কিন্তু ডালকুত্তোটা আমায় ঠিক তাড়া করে এল। কুকুরগুলো কী বজ্জাত।" এমন সময় জিম্মাকে দেখে "অন্য কুকুর নয়, ওই ডালকুত্তোগুলোর মতো বজ্জাত দেখি নি, বাপু।" এই বলে সোনালিয়া একটু লুকোবার স্থান দেখিয়ে দিতে কুঁকড়োকে বার-বার বলতে লাগল। কুঁকড়ো একটু সমিস্যায় পড়লেন। আগুনের ফুলকি এই সোনালিয়া পাখি, একে কোন্ ছাইগাদায় তিনি লুকোবেন। তিনি দু-একবার এ-কোণ ও-কোণ দেখে, এখানটা-ওখানটা দেখে বললেন, "না, এঁকে আর রামধনুককে লুকোতে পারা কঠিন।"

জিম্মা বললে, "আমার ওই বাক্সটার মধ্যে লুকোতে পারা যেতে পারে, ইনি যদি রাজি হন।"

"ভালো কথা।" বলেই সোনালি গিয়ে বাক্সে সেঁধোলেন, কিন্তু অনেকখানি সোনালি আঁচল বাক্সের বাইরে ছড়িয়ে রইল, জিম্মা সেটুকু ঢেকে চেপে গম্ভীর হয়ে বসল।

জিম্মা বেশ বাগিয়ে বসেছে, এমন সময় বেড়ার ওধার থেকে ঝোলা-কান গালফুলো ডালকুত্তো 'তম্মা' উঁকি দিলেন। জিম্মা যেন দেখতেই পায় নি এই ভাবে রুটিই চিবচ্ছে। তম্মা বললে, "উঃ কিসের খোসবো ছাড়ছে।" জিম্মা সামনের থালাখানা দেখিয়ে বললে, "আজ একটু বনমুরগির ঝোল রাঁধা গেছে।"

ডালকুত্তো এবার পষ্ট করে শুধোলে, জিম্মা এদিকে একটা সোনালিয়া পাখিকে আসতে দেখেছে কিনা। কুঁকড়ো সে কথা চাপা দিয়ে বলে উঠলেন, "তম্মার মুখটা কেমন গোমসা দেখাচ্ছে-না, জিম্মা।"

জিম্মা ধীরে সুস্থে উত্তর করলে, "একটা সোনালী টিয়ে মাঠের উপর দিয়ে উড়ে গেল দেখিছি, ওই ওদিকে—।" তম্মাটা আকাশে নাক তুলে কেবলি শুঁকতে লেগেছে, বনমুরগির গন্ধটা সত্যিই জিম্মার থালা থেকে আসছে কি না। কুঁকড়োর বুকের ভিতরটা বেশ একটু-খানি গুরগুর করছে, এমন সময় দূর থেকে শিকারী সিটি দিয়ে তম্মাকে ডাক দিলে। তম্মা চলল দেখে কুঁকড়ো আর জিম্মা "রাম বলো" বলে হাঁফ ছাড়তেই চড়াইটা ডাক দিলে, "বলি তম্মা।"

"করো কী।" ব'লে কুঁকড়ো তাকে এক ধমক দিলেন, কিন্তু চড়াইটা আরো চেঁচিয়ে বলে উঠল, "বলি, ও তম্মা।" তম্মার গোমসা মুখটা আবার বেড়ার উপর দিয়ে উঁকি দিলে। কুঁকড়ো রেগে ফুলতে লাগলেন, চড়াই তম্মাকে বললে, "খুঁজে খুঁজে নারি যে পায় তারি।"

তম্মা শুধোলে, "কী খুঁজে দেখি, বলো তো ভাই?"

"চটপট তোমার ফোগলা গালের চির-খাওয়া দাঁতটি।" বলেই চড়াই সট করে নিজের খাঁচায় ঢুকল; "চোপরাও" বলে তম্মা সে তল্লাট ছেড়ে চোঁচা চম্পট।

ডালকুত্তোটা মাঠের ওপারে চলে গেছে। কুঁকড়ো সবাইকে অভয় দিয়ে ঘরের মটকা থেকে হাঁক দিলেন, "ত-ত-তফাত গিয়া।" অমনি সে-সোনালিয়া বাক্সের মধ্যে থেকে বেরিয়ে উঠোনময় নেচে বেড়াতে লাগল যেন আলোর চরকিবাজি। কুঁকড়ো তার সেই ঝকঝকে রূপ দেখে ভারি খুশি হয়ে মনে মনে বললেন, 'আহা, এমন পাখিকেও কেউ গুলি করে। এর দিকে বন্দুক করা, আর একটি মানিকের পিঠুমে তাগ করা একই।' সোনালির কাছে আস্তে আস্তে এসে কুঁকড়ো শুধোলেন, "সূর্যের আলোর মতো কোন্ পুব-আকাশের সোনার পুরী থেকে তুমি এলে সোনালিয়া বনমুরগি।"

সোনালি মাখমের মতো নরম সুরে বললে, "আমি ওই বনে আছি বটে কিন্তু ওটা তো আমার দেশ নয়।" কুঁকড়ো তাঁর সবচেয়ে মিষ্টি সুরে শুধোলেন, "তবে কোথায় তোমার দেশ সোনালিয়া বিদেশিনী।" সোনালি উত্তর করলে, "তা তো মনে নেই। শুনেছি বরফের পাহাড়ের ওপারে যে-দেশ, সেখানকার মাটি ফুল-কাটা গালচেতে একেবারে ঢাকা, সেইখানের কোন্ অশোক বনের রানীর মেয়ে আমি। আমার একটু একটু স্বপ্নের মতো মনে পড়ে—চমৎকার নীল আকাশের তলায় বড়ো বড়ো গাছের ছাওয়ায় সখীদের সঙ্গে খেলে বেড়াচ্ছি অশোক বনের দুলালী। আমাদের ঘরের চারি দিকে কত রঙের ফুল ফুটেছে, ভোমরা সব উড়ে উড়ে পদ্মের মধু খেয়ে যাচ্ছে। কেবল পাখি আর প্রজাপতি আর ফুল। একটাও শিকারী ডালকুত্তো নেই। মানুষরা পর্যন্ত সেখানে আমাদের মতো চমৎকার সব রঙিন সাজে সেজে রাজা-রানীর মতো বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে। নন্দন-কাননে আনন্দে ঘুরে বেড়াতেই আমি জন্মেছি, ডালকুত্তোর তাড়া খেয়ে ছুটোছুটি করে মরতে তো নয়। আহা, সেখানকার সূর্যের লাল আভা রক্ত-চন্দন আর কুসুম-ফুলের রঙে মিশিয়ে বুকে মেখে রেখেছি, এই দেখো।" ব'লে সোনালিয়া কুঁকড়োর গা-ঘেঁষে দাঁড়াল। কুঁকড়ো আনন্দে ডগমগ হয়ে ঘাড় দুলিয়ে ডানা কাঁপিয়ে তালে তালে পা ফেলে সোনালিয়ার চারি দিকে খানিক নৃত্য করে আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে বললেন, "সনো সোনালিয়া। শোনো সোনালিয়া বিদেশিনী বনের টিয়া—" হঠাৎ সোনালি বলে উঠল, "ইস্।"

কুঁকড়ো একটু থতমত খেয়ে গেলেন। বুঝলেন সোনালিয়া সহজে ভোলবার পাত্রী নয়। যে-কুঁকড়ো তাদের দিকে একটিবার ঘাড় হেলালে সাদি কালি গোলাপি গুলজারি সব মুরগিই আকাশের চাঁদ হাতে পায় মনে এমনি করে সেই জগৎবিখ্যাত কুঁকড়োকে মোনালি মুখের সামনে শুনিয়ে দিলে যে জগতের সবাই যাকে ভালোবাসে এমন কুঁকড়োয় তার দরকার নেই! সে বেছে বেছে সেই কুঁকড়োকে বিয়ে করবে যার নাম-যশ কিছুই থাকবে না; থাকবার মধ্যে থাকবে যার মনমোনালিয়া বনের টিয়া একমাত্র মুরগি।

কুঁকড়ো খানিক চুপ করে থেকে বললেন, "একবার গোলাবাড়ির চার দিক দেখে আসবেন চলুন।" ব'লে তিনি সোনালিয়াকে খুব খাতির করে সব দেখাতে লাগলেন। প্রথমেই, যেটা থেকে অজ্ঞান হয়ে পড়লে সোনালিয়ার মুখে চোখে জল ছিটিয়ে কুঁকড়ো তাকে বাঁচিয়েছিলেন সেই টিনের গামলাটা আর যে কাঠের বাক্সটায় সোনালিয়াকে লুকিয়ে রেখে তন্মার চোখে ধুলো দিয়েছিলেন সেই হুটো জিনিস দেখিয়ে বললেন, "এগুলো নতুন কিনা, কাজেই কুচ্ছিৎ; কিন্তু পুরোনো দেয়াল, ভাঙা বেড়া, ফাটা দরজা, পুরোনো ওই মুরগির ঘরটি আর কতকালের ওই লাঙল, ধানের মরাই আর ওই শেওলায় সবুজ খিড়কির হুয়োর আর পানা-পুকুর আর ওই কুঞ্জলতার থোকা-থোকা ফুল, কী সুন্দর এগুলি।"

সোনালিয়া কোনোদিন তো ঘরকন্নার ব্যাপার দেখে নি, সে কেবলি কুঁকড়োকে শুধোতে লাগল, "এ-সব নতুন জিনিসের মধ্যে থাকায় কোনো ভয় নেই তো।" কুঁকড়ো তাকে বললেন, "আমরা বেশ নির্ভয়ে আছি— মোরগ মুরগি হাঁস এবং মানুষ। কেননা, এ-বাড়ির কর্তা— তিনি নিরামিষ খান, কাজেই আণ্ডা বাচ্ছা নিয়ে আমাদের সুখে থাকবার কোনো বাধা নেই। ওই দেখুন-না, বেড়াল পাঁচিলের উপর ঘুমিয়ে আছে, আর ঠিক তার নীচেই আমার সব-ছোটো বাচ্ছাটা খেলে বেড়াচ্ছে গাঁদা গাছটার তলায়।" ইতিমধ্যে চড়াইটা চট করে কখন্ চিনে-মুরগিকে সোনালিয়ার খবরটা দিয়ে ফুড়ুৎ করে উঠোনে এসে বসল। সোনালিয়া শুধোলেন, "ইনি?" চড়াই অমনি উত্তর দিলে, "ইনি এইমাত্র চিনে-মুরগিকে আপনার শুভ আগমন জানিয়ে এলেন। তিনি আপনার সঙ্গে দেখা করতে এলেন বলে।" কুঁকড়ো পরিচয় দিলেন, "ইনি তাল-চটকমশায়, সর্বদা কাজে ব্যস্ত।" সোনালিয়া শুধোলে, "কী কাজ।"

চড়াই সঙ্গে সঙ্গে উত্তর করলে, "বড়ো কঠিন কাজ, নিজের ধন্ধায় ফিরছেন ইনি, পাছে কেউ উপর-চাল চেলে টেক্কা দেয়।"

সোনালিয়া বললে, "হ্যাঁ কাজটা শক্ত বটে, কিন্তু অতি ছোটো।"

কুঁকড়ো অন্য কথা পেড়ে সোনালিয়াকে চুন-খসা দেয়ালের ধারে পুরোনো জাঁতাটা দেখিয়ে বললেন, "ওই পাঁচিলটার উপরে দাঁড়িয়ে আমি যখন গান করি তখন সোনালী রঙের গিরগিটিগুলো দেয়ালের গায়ে চুপ করে বসে শোনে। মনে হয় যেন ওই জাঁতার মোটা পাথর দুখানাও দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে বসে-বসে আমার গান শুনছে। এইখানটিতে আমি গান গাই, এইখানের মাটি আমি পরিষ্কার করে আঁচড়ে রেখেছি। আর এই যে পুরোনো লাল মাটির গামলা, গানের পূর্বে ও পরে প্রতিদিন এরি থেকে এক চুমুক জল না খেলে আমার তেষ্টাও ভাঙে না, গলাও খোলে না।" সোনালিয়া একটু হেসে বললে, "তোমার গলা খোলা না-খোলায় বুঝি খুব আসে যায় তোমার বিশ্বাস।"

"অনেকটা আসে যায় সোনালি।" গম্ভীরভাবে কুঁকড়ো বললেন।

"কী আসে যায় শুনি?" সোনালিয়া নাক তুলে বললে।

কুঁকড়ো বললেন, "ওই গোপন কথাটা কাউকে বলবার সাধ্য আমার নেই।"

"আমাকেও না?" কুঁকড়োর দিকে এগিয়ে এসে অভিমানের সুরে সোনালিয়া বললে, "আমি যদি বলতে বলি, তবুও না?"

কুঁকড়ো কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে সোনালিকে এক বোঝা কাঠ দেখিয়ে বললেন, "আমাদের প্রিয়বন্ধু, রান্নাঘরে শ্মশানে চ, ইনি চালা কাঠ।" "এ যে আমার বন থেকে চুরি করা দেখছি।" বলে সোনালিয়া আবার শুধোলে, "তবে তোমারও একটা গুপ্ত মন্তর আছে।"

"হ্যাঁ বন-মুরগি। এই কথাটা কুঁকড়ো এমনি সুরে বললেন যে সোনালিয়া বুঝলে গোপন কথাটা জানবার চেষ্টা এখন বৃথা।

কুঁকড়ো সোনালিকে নিয়ে গোলাবাড়ির বাইরের পাঁচিলে উঠলেন। সেখান থেকে তিনি দেখালেন দূরে পাহাড়ের গা বেয়ে জলের মতো সাদা একটা সরু সাপ কতদিন ধরে যে নামছে তার ঠিক নেই।

সব দেখে শুনে সোনালিয়া কুঁকড়োকে বললে, "এইটুকু জায়গা, তাও আবার নেহাত কাজ-চলা-গোছের জিনিসপত্তরে ভরা, এখানে একঘেয়ে দিনগুলো কেমন করে তোমরা কাটাও বুঝি না। আকাশ দিয়ে যখন পাখিরা উড়ে চলে তখন তোমার মন নতুন দেশ বড়ো-পৃথিবীটা দেখবার জন্যে একটুও আনচান করে না?"

কুঁকড়ো বললেন, "একটুও নয়। পৃথিবীতে একঘেয়ে দিনও নেই, পুরোনোও কিছু হয় না। আমি এইটুকু জায়গাকেই প্রতিদিন নতুন নতুন ভাবে দেখতে পাই। কিসের গুণে তা জান? আলোর গুণে।"

সোনালি অবাক হয়ে বললে, "আলোর গুণে। সে আবার কী রকম।"

"দেখো'সে।" বলে কুঁকড়ো একটি স্থলপদ্মের গাছ দেখিয়ে বললেন, "দিনের আলোর সঙ্গে এই ফুলের রঙ ফিকে থেকে গাঢ় লাল হবে দেখবে। এই খড়ের কুটিগুলো আর এই লাঙলের ফলাটা আলো পেয়ে দেখো কত রকমই রঙ ধরছে। ওই কোণে মইখানার দিকে চেয়ে দেখো ঠিক মনে হচ্ছে নাকি এটা যেন দাঁড়িয়ে ঘুমচ্ছে আর ধানখেতের স্বপ্ন দেখছে। আর মানুষ যেমন পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে, ঠিক তেমনি করে ওই পিঁপড়েগুলো দেখো এই চিনেমাটির জালাটার চারি দিক প্রদক্ষিণ করে আসছে আট পল এক বিপলের মধ্যে। পলকে পলকে এখানকার সব জিনিসই নতুন নতুন ভাব নিয়ে দেখা দিচ্ছে নতুন আলোতে। আর আমিও কুঁকড়ো ওই মইখানার মতো আপনার কোণটিতে দাঁড়িয়ে রোজ রোজ কত আশ্চর্য ব্যাপারই দেখছি। দেখে দেখে চোখ আর তৃপ্তি মানছে না; চোখের দৃষ্টি আমার নতুনের পর নতুন, ছোটো এই গোটাকতক জিনিসের অফুরন্ত শোভা, এই ক-টা সামান্য জিনিসের অসামান্য রূপ দেখতে দেখতে দিন দিন খুলেই যাচ্ছে, বেড়েই চলেছে, ডাগর হয়ে উঠছে মহা বিস্ময়ে। ওই কুণ্ডলতার কুঁড়িটি ফুটতে দেখে যে আনন্দ পাই, মুরগির ডিমগুলি যখন ফোটে বাচ্ছাগুলির চোখ যখন ফোটে তখনো আমি তেমনি আনন্দ পেয়ে গেয়ে উঠি। এইটুকু জায়গা, এখানে কী যে সুন্দর নয় তা তো আমি জানি নে।"

কুঁকড়োর কথা শুনতে শুনতে সোনালিয়া ক্রমেই অবাক হচ্ছিল। ছোটোখাটো সব সামান্য জিনিসের উপরে আলো ধ'রে এমন চমৎকার ক'রে তো কেউ তাকে দেখায় নি। আপনার

ছোটো কোণটিতে চুপচাপ বসে থেকেও যে সবই খুব বড়ো করে দেখা যায় আজ সোনালি সেটি বুঝে অবাক হল।

কুঁকড়ো বললেন, "সব জিনিসকে যদি তেমন করে দেখতে পার তবে সুখদুঃখের বোঝা সহজ হবে; অজানা আর কিছু থাকবে না। ছোটো একটি পোকার জন্ম-মরণের মধ্যে পৃথিবীর জীবন আর মৃত্যু ধরা রয়েছে দেখো, একটুখানি নীল আকাশ ওরি মধ্যে কত কত পৃথিবী জ্বলছে নিভছে।"

মুরগি-গিন্নি অমনি পেঁটরার মধ্যে থেকে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে বললে, "কুয়োর তলে পানি, আকাশকেই জানি।" পেঁটরার ডালা আবার বন্ধ হবার আগেই কুঁকড়ো সোনালিকে মায়ের সঙ্গে পরিচয় করে দিলেন। মুরগি-গিন্নি চোখ মটকে চুপি চুপি বললেন, "বড়ো জবরদস্ত কুঁকড়ো, না?"

সোনালি মিহি সুরে বললে, "হুঁ, উনি খুব বিদ্বান বুদ্ধিমান।"

এদিকে কুঁকড়ো জিম্মাকে বলছিলেন, "সোনালিয়ার সঙ্গে দুদণ্ড কথা কয়ে আরাম পাওয়া যায়, সব-বিষয়ে সে কেমন একটু উৎসাহ নিয়ে জানতে চেষ্টা করে দেখেছ।"

এমন সময় কিচমিচ চেঁচামেচি করতে করতে মাঠ থেকে দলে-দলে হাঁস মুরগি ধাড়ি বাচ্ছা সবাইকে নিয়ে চিনে-মুরগি উপস্থিত। এসেই সবাই সোনালিয়াকে ঘিরে 'আহা কী সুন্দর' 'ক্যাব্যাৎ' 'বাহবা' 'বেহেতর' এমনি-সব নানা কথা বলতে লাগল। কুঁকড়ো একটু দূরে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে এই ব্যাপার দেখছিলেন। কী সুন্দর দেখাচ্ছে সোনালিয়াকে। তার চলন বলন সবই বেশ কেমন একটু ভদ্দর রকমের। গোলাবাড়ির কোনো মুরগিই এমন নয়। চিনে-মুরগিরও সোনালি বউ করবার সাধ একটু যে না হয়েছিল তা নয়; সে তাড়াতাড়ি নিজের ছেলের সঙ্গে সোনালিয়ার ভাব করে দিতে দৌড়ল।

কুঁকড়ো এইবার তাঁর সব মুরগিদের ঘরে যেতে হুকুম দিলেন। সোনালিয়া আরো খানিক তাদের সঙ্গে গল্প করবার ইচ্ছে করায় কুঁকড়ো বললেন, "ওদের সব সকাল সকাল ঘুমনো অভ্যেস।" মুরগিরা একটু বিরক্ত হয়ে সব শুতে চলল মই বেয়ে নিজের নিজের খোপে। সোনালিয়া শুধলে, "কোথায় যাচ্ছ ভাই।"

এক মুরগি বললে, "বাড়ি চলেছি। এই যে আমাদের ঘরে যাবার সিঁড়ি।"

মই বেয়ে মুরগিদের উঠতে দেখে সোনালিয়া অবাক হয়ে গেল। বনের মধ্যে তো এ-সব কিছুই নেই।

চিনে-মুরগি সোনালিয়ার সঙ্গে খুব আলাপ জমিয়ে বন্ধুত্ব করবার চেষ্টায় আছেন, সোনালিয়া তাকে বললে যে, এখনি তাকে আবার বনে ফিরে যেতে হবে, গোলাবাড়িতে সে কেবল দুদণ্ডের জন্যে এসেছে বৈ তো নয়। ঠিক সেই সময় দূরে দুম করে আবার বন্দুকের আওয়াজ হল। এখনো শিকারীগুলো বন ছেড়ে যায় নি, কাজেই সোনালিকে কিছুতেই বনে একলা পাঠাতে কুঁকড়োর একটু ইচ্ছে নেই। গোলাবাড়ির সবাই তাকে আজকের রাতটা কোনোরকমে সেখানে কাটাতে অনুরোধ করতে লাগল। জিম্মা নিজের বাক্সটা রাতের মতো সোনালিকে ছেড়ে দিয়ে বাইরে শুতে রাজি হল। বন্ধ ঘরের মধ্যে সোনালি কোনোদিন শোয় নি ; কিন্তু কী করে। প্রাণের দায়ে তাতেই সে রাজি হল। চিনে-মুরগির আহ্লাদ আর ধরে না, সে সোনালিকে তার সকালের মজলিসে যাবার জন্যে আবার ধর-পাকড় করতে লাগল। এমন সময় অন্ধকার হয়ে আসছে দেখে কুঁকড়ো ডাক দিলেন, "চুপ রহ। চুপ রহ।" তার পর মইটা বেয়ে মটকায় উঠে তিনি চারি দিকটা একবার বেশ করে দেখে নিলেন, হাঁস মোরগ মুরগি কাচ্ছা বাচ্ছা সবাই আপনার আপনার খোপে যে যার মায়ের কোলে ডানার নীচে সেঁধিয়েছে কি না। চিনে-মুরগি সোনালির কানে কানে বললে, "মনে থাকবে তো ভাই, কুলতলায় ভোর পাঁচটা থেকে ছটার সময়। ময়ুর নিশ্চয় আসবেন, কাছিম বুড়োও আসবেন বোধ হয়, আর সুরকি-দিদি বলেছে কুঁকড়োকেও নিয়ে যাবে।" কুঁকড়ো একবার সুরকির দিকে চেয়ে দেখলেন, সুরকি খোপ থেকে আস্তে আস্তে মুখটি বার করে গিন্নিপনা করে বললে, "তুমিও যাবে তো। চিনি-দিদির ভারি ইচ্ছে। আমারও ইচ্ছে তুমি পাঁচজনের সঙ্গে একটু মেশো, ছেলেমেয়ের তো বিয়ে দিতে হবে।"

কুঁকড়ো সাফ জবাব দিলেন, "না।" সোনালি মইখানার নীচে থেকে কুঁকড়োর দিকে মুখ তুলে খুব মিষ্টি করে বললে, "যেতেই হবে তোমায়।"

কুঁকড়ো মুখ নিচু করে বললেন, "কেন বলো তো।" সোনালিয়া বললে, "সুরকি-দিদির

আবদারে তুমি অমন 'না' করলে যে।"

কুঁকড়ো একটু গললেন। "আমি তা—" তার পর খুব শক্ত হয়ে বললেন, "না, কিছুতেই যাব না। রাত হল," বলে কুঁকড়ো অন্য দিকে চাইলেন। সোনালি একটু বিরক্ত হয়ে কুকুরের বাক্সতে গিয়ে সেঁধলেন।

রাত্রির নীল অন্ধকার ক্রমে ঘনিয়ে এসেছে। একে-একে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। জিম্মা ঘরের দাওয়ায় পা ছড়িয়ে শুয়েছে। চিনি-দিদি ঘুমের ঘোরে এক-একবার বকতে লেগেছে, "৫টা থেকে ৬টা।" তাল-চড়াইটা তার খাঁচার এককোণে গুটিসুটি হয়ে ঘুম দিচ্ছে। কুঁকড়ো তখনো মটকার উপরে খাড়া দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছেন আর চারি দিক চেয়ে দেখছেন। একটা দুষ্টু বাচ্ছা রাতের বেলায় চুপি চুপি উঠোনে বার হয়েছে দেখে কুঁকড়ো তাকে এক ধমক দিয়ে তাড়িয়ে ঘরে ঢুকিয়ে দিলেন। তার পর আস্তে আস্তে সোনালির বাক্সটার কাছে গিয়ে কুঁকড়ো বললেন, "মোন।" ঘুম ঘুম স্বরে সোনালিয়া উত্তর দিলে, "কী।" কুঁকড়ো একবার বললেন, "না।" তার পর আবার নিশ্বেস ছেড়ে বললেন, "নাঃ, কিছু নয়।" বলে কুঁকড়ো মই বেয়ে উপরে চলে গেলেন। উপরে গিয়ে কুঁকড়ো একবার ডাক দিলেন, "রাত, ভারী রাত।" তার পর কুঁকড়ো সে রাতের মতো চোখ বুজলেন খোপে ঢুকে।

চারি দিক নিশুতি হল আর অমনি কালো বেড়ালের সবুজ চোখদুটো অন্ধকারে ঝকঝক করে উঠল। অমনি ভোঁদড় বললে, "আমিও তবে চোখ খুলি।" ভাম বললে, "আমিও।" দুজোড়া চোখ ছাদের আলসেতে জ্বলজ্বল করে ঘুরতে লাগল। ছুঁচো ইঁদুর আর বাদুড় তিনজনেই বললে, "আমরাও তবে চোখ খুললেম।" কিন্তু এদের চোখ এত ছোটো যে খুলল কি না বোঝা গেল না, কেবল তাদের চিক চিক আওয়াজ শোনা গেল। একটু পরেই অন্ধকার থেকে তিনটে পেঁচা আগুনের মতো তিন জোড়া চোখ খুলে স্ফুট করে দেখা দিলে। তখন সবুজ হলদে লাল— সব চোখ এ ওর দিকে চাওয়া-চাওয়ি করতে থাকল আর বলাবলি করতে লাগল, "আছ তো? এসেছ? আছ তো, এ্যঁ এ্যঁ এ্যঁ।" বেড়াল পেঁচাকে শুধল, "আছ তো।" পেঁচা ভোঁদড়কে, ভোঁদড় বাদুড়কে, এমনি সবাই সবাইকে শুধলে, "আছ তো। ঠিক আছ তো। ঠিক আজকে তো। আসছ তো ঠিক।" বেড়াল শুধলে, "আজই

নাকি।” পেঁচা-তিনটে জবাব দিলে, “হাঁঃ হাঁঃ হাঁঃ।” চড়াই খাঁচার মধ্যে জেগে উঠে শুনলে এক পেঁচা আর-এক পেঁচাকে শুধচ্ছে, “ঘোঁট কিসের।” অন্য পেঁচা বলছে, “কুঁকড়োর সর্বনাশের ঘোঁট রে ঘোঁট।” ভোঁদড় অমনি শুধলে, “কো-ও-থায়।” পেঁচারা উত্তর দিলে, “পাকুড়তলে, পাকুড়তলে, পাকুড় পাকুড় পাকুড়তলে।” ভাম শুধলে, “ক-খ-ন।” উত্তর হল, “আটটায় ঘুঁট। আটটায় ঘুঁট। আটটায় ঘুঁট। ঘুট ঘুটে রাতে। ঘুট ঘুটে রাতে।”

রাতের আঁধারে বাদুড়গুলো জাদুকরের হাতে তাসের মতো একবার দেখা দিচ্ছিল আবার কো[illegible] উড়ে যাচ্ছিল। বেড়াল পেঁচাকে শুধলে, “বাদুড় তো আমাদের দলে বটে।” পেঁচা বললে, “হাঁ নিশ্চয়।” “ছুঁচো ইঁদুর?” “হাঁ তারাও।”

বেড়াল বাড়ির দরজা আঁচড়ে বললে, “পিউ পিউ পিউ। দিয়ো পিউ আটটায় ঘড়ি দিয়ো দিয়ো দিয়ো।” পেঁচা শুধলে, “ঘড়িটাও এ দলে নাকি।” বেড়াল উত্তর করলে, “নি-শ-চয়। নিশাচর সবাই এ দলে; তা ছাড়া দিনের বেলারও দু-চার জন আছেন।” পেরু আর দু-চার জন উঠোনের এককোণে লুকিয়ে ছিল, আস্তে আস্তে বেরিয়ে এল। পেরু শোধালে, “ড্যাবা চোখ, ঢাকা মুখ। সব ঠিক তো।” উত্তর হল, অন্ধকার থেকে—“হাঁঃ হাঁঃ হাঁ। সব ঠিক, ঘুঁটটা ঠিক, এ পাড়া ঠিক, ও পাড়া ঠিক।” তাল-চড়াই মনে মনে বললে, ‘সেও যাচ্ছে ঠিক।’

কুকুর এমন সময় গা-ঝাড়া দিয়ে বলে উঠল, “কে ও।” অমনি সব নিশাচরগুলো চমকে উঠে এদিক ওদিক চাইতে লাগল। বেড়াল তাদের সাহস দিয়ে বললে, “ও কিছু নয়, বুড়িটা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বকছে।” কিন্তু এবার কুঁকড়ো যেমন একটু গা-ঝাড়া দিয়ে সাড়া দিয়েছেন, “কি-ই-ও।” অমনি সব নিশাচর—পেঁচা, বেড়াল, এমন-কি, পেরু পর্যন্ত ‘ওইগো’ বলেই পালাই পালাই করতে লাগল। পেরু, তিনি পালানোই স্থির করলেন, তাঁর গলার থলি থেকে পা পর্যন্ত ভয়ে কাঁপছিল; বেড়ালের যেন জ্বর এসে পড়ল, পেঁচাগুলো চোখ বুজলেই অন্ধকারে মিলিয়ে যাবে জানে, তারা অমনি খপ করে চোখের পাতা বন্ধ করে ফেললে। একসঙ্গে সব জ্বলন্ত চোখ নিভে গেল। রাত্রি যে অন্ধকার সেই অন্ধকার। কুঁকড়ো ঘর থেকে বেরিয়ে এসে চড়াইকে শুধলেন, “কারা যেন ফুসফাস করছিল না।”

চড়াই বললে, "শুনছিলেম বটে একটা ঘোঁট চলেছে।" ঘুটঘুটে অন্ধকারে সব ঘুঁটেগুলো এমন কাঁপতে লাগল যে রাত্রিটা দুলছে বোধ হল।

কুঁকড়ো বললেন, "বটে, ঘোঁট চলেছে?"

চড়াই বললে, "হাঁ তোমার সর্বনাশের, সাবধান।" "বয়ে গেল।" বলে কুঁকড়ো আবার গিয়ে ঘরে ঢুকলেন।

চড়াই আবার ভালোমানুষটির মতো গা-ঝাড়া দিয়ে বসল। সে ঠিক-ঠিক কথাই বলেছে কিন্তু কেমন দুদিক বাঁচিয়ে বলেছে। যুধিষ্ঠিরের অশ্বত্থামাহত-ইতি-গজ গোছের। কথাটা চড়াইয়ের মুখে শুনে কিন্তু পেঁচাদের সন্দেহ বাড়ল। "চড়াই সত্যিই তাদের দলে কি না" —শুধতে অন্ধকারের মধ্যে একটার পর একটা চোখ চড়াইয়ের দিকে চাইতে লাগল। চড়াই বললে, "আমি বাপু কোনো দলে নেই; তবে ঘোঁটটা কেমন চলে দেখতে ইচ্ছে আছে।" পেঁচাতে চড়াই খায় না, কাজেই ঘোঁটে গেলে কোনো বিপদ তার নেই বলে পেঁচারা চড়াইকে মন্ত্রণাসভায় যাবার স্থানটি বাতলে দিয়ে বললে, " 'চোরের মন পুঁই-আঁদাড়ে', এই শোলক বললেই সে দরজা খোলা পাবে।"

এ দিকে ঘরের মধ্যে থেকে সোনালিয়ার হাঁপ ধরছিল; সে একটু ভালো হাওয়া পেতে ঘর থেকে মুখ বার করেই সব নিশাচরকে দেখে 'একি!' ব'লে চমকে উঠল। অমনি সব চোখ একসঙ্গে ঝপ করে বন্ধ হয়ে গেল। অনেকক্ষণ আর সাড়া-শব্দ নেই। তখন অন্ধকারে একটির পর একটি চোখ খুলল আর বলাবলি শুরু হল। সোনালিয়া চুপ করে শুনছে কে একজন উঠোনের ও-কোণ থেকে বললে, "বেঁচে থাকো পেঁচা-পেঁচিরা।" পেঁচারা শুধলে, "আমরা তো ওর নামটি পর্যন্ত সইতে পারি নে তা জানো, কিন্তু তোমরা তার উপর চটা কেন বলো তো।"

দিনের বেলায় যারা দুষ্টবুদ্ধি লুকিয়ে বেড়ায়, রাত্রে তাদের পেটের কথাটা আপনিই যেন প্রকাশ হয়ে পড়ে। বেড়াল খুব চাপা জন্তু কিন্তু আগেই তার কথা বেরিয়ে পড়ল, "ওই কুকুরটার সঙ্গে অত তার ভাব ব'লেই কুঁকড়োটাকে দুচক্ষে আমি দেখতে পারি নে।" পেরু বললেন, "যাকে সেদিন জন্মাতে দেখলেম, সে আজ কর্তা হয়ে উঠল, এটা আমি কিছুতেই সইব না।

এইজন্যে আমার রাগ ওটার উপর।” রাজহাঁস বললে, “ওর পা দুখানা বড়ো বিশ্রী, একেবারে হাঁসের মতো নয়। দেখলেই আমার মাথা গরম হয়ে ওঠে, গোড়ালির ছাপ তো নয়, চলবার বেলায় মাটির উপরে বাবু যেন তারাফুল কেটে চলে যান। কী দেমাক।” কেউ বললে, “কুঁকড়োর চেহারাটা ভালো বলেই সে তাকে পছন্দ করে না। কেন সে নিজে কুচ্ছিত হল কুঁকড়োটা হল না!”

আর কেউ কেউ বললে, “সব ক-টা গির্জের চুড়োতে তার সোনার মূর্তি দেখলে কার না গা জ্বালা করে। নিশ্চয়ই ও পাখিটা কিস্টান। ওকে জাতে ঠেলাই ঠিক। মোচনমানের সঙ্গে এক ঘটিতে জল খেতে আমি ওকে স্বচক্ষে দেখেছি। ওর কি বাচবিচার আছে। ওর ছায়া মাড়াতে ভয় হয়।”

ঠিক সেই সময় ঘড়ি পড়ল আর ঘড়ির মধ্যে কলের পাখি বলে উঠল, “পি-পি-পি-রা-আ-আ-লি।”

মেঘের আড়াল থেকে চাঁদ অমনি উঁকি দিলেন। উঠোনের এক কোণে খানিক আলো পড়ল। ছুঁচো আস্তে আস্তে মুখ বার করে পেঁচাকে বললে, “আমার সে পাজিটার সঙ্গে কোনোদিন চোখোচোখিই নেই।”

ঘড়িকলের পাখিটাকে আর শুধতে হল না; সে আপনিই বললে, “একটুতে আমার দম ফুরিয়ে যায়, রোজ দম না দিলে মুশকিল, আর কুঁকড়োর দমের শেষ নেই।” ব’লেই গলা ঘড় ঘড় করে ঘড়িপাখি চুপ করলে। টং টং করে আটটা বাজল। পেঁচারা সব ডানা মেলে বললে, “আর আমরা কুঁকড়োকে একটুও ভালোবাসি নে, কেননা—কেননা ও কিনা—সে কিনা” বলতে বলতে অন্ধকারের মধ্যে পেঁচারা উড়ে পড়ল নীল রাত্রির মধ্যে। একলা সোনালিয়া উঠোনে দাঁড়িয়ে বললে, “আর কুঁকড়োকে আমি এখন খুব ভালোবাসি, কেননা—কেননা— সবাই তাঁর শত্রু।”

খেত আর আবাদ যেখানে শেষ হয়েছে, সেইখানে পাহাড়ের একটা ঢল, সেইখানে পেঁচাদের ঘোঁটের মজলিস বসবে। অতি নোংরা ঢালু জমি ; শেয়ালকাঁটা, বাবলাকাঁটায় ভরা ; উপরে মস্ত পাকুড় গাছটা, সরু একটা পাগদণ্ডি বেয়ে সেখানে উঠতে হয়। রাত্রে জায়গাটাতে এলে ভয় করে কিন্তু দিনের বেলায় যখন সূর্য ওঠে, এখান থেকে ছায়ায় বসে পাহাড়ে-ঘেরা গ্রাম, নদী সবই অতি চমৎকার দেখায়।

পাকুড় গাছে, লতা-পাতায় ঝোপে-ঝাড়ে জায়গাটা এমনি ঢাকা যে একবিন্দুও চাঁদের আলো সেখানে পড়তে পায় না। সেই ঘুটঘুটে অন্ধকারে হুতুম পেঁচার চোখ টিপটিপ করে জ্বলছে, আর কিছু দেখাও যাচ্ছে না, শোনাও যাচ্ছে না, অথচ অনেক পাখিই আজ সেখানে জুটেছে ঘোঁট করতে। পেঁচার সর্দার হুতুম একে একে নাম ধরে ডাকতে লাগলেন, আর চারি দিকে একটার পর একটা লাল, নীল, হলদে, সবুজ চোখ জ্বালিয়ে দেখা দিতে থাকল একে একে ধুঁধুল পেঁচা, কাল্ পেঁচা, কুটুরে পেঁচা, গুড়গুড়ে পেঁচা, দেউলে পেঁচা, দালানে পেঁচা, গেছো পেঁচা, জংলা পেঁচা, পাহাড়ী পেঁচা। হুথুমথুমো ডেকে চলেছে, "ভুতো পেঁচা, খুদে পেঁচা, চিলে পেঁচা, গো-পেঁচা, গোয়ালে পেঁচা, লক্ষ্মী পেঁচা," লক্ষ্মী পেঁচার দেখা নেই, চোখও জ্বলছে না। হুতুম ঘাড় ফুলিয়ে রেগে ডাক দিলে," ল-ক্-খী-পেঁ-এঁ্যা-এঁ্যা-চা-আ আ।" লক্ষ্মী পেঁচা তাড়াতাড়ি এসে চোখ খুলে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, "অনেক দূর থেকে আসতে হয়েছে, বিলম্ব হয়ে গেল।" চিলে পেঁচা চেঁচিয়ে বললে, "সেইজন্যেই ত্বরা করা তার উচিত ছিল।"

সব পেঁচা একত্র হয়েছে, তখন হুতুম গম্ভীরভাবে বললেন, "কাজ আরম্ভ হবার আগে এসো ভাই সব এককাট্টা হয়ে এক সুরে নিজের নিজের ঢাকের বাদ্যি বাজিয়ে দিই, "হুতুম-থুম, হুহুম-হুম। লাগ লাগ ঘুঁট। লাগ লাগ ঘুঁট। দে ধুলো, দে ধুলো, দে ধুলো, চোরা-আ-আ গো-ফ-তা।" সমস্ত রাত্রিটার অন্ধকার বিকট শব্দে ভ'রে দিয়ে পেঁচাগুলো ডানা ঝাপটাতে লাগল, আর অন্ধকারের জয় দিতে থাকল,

ঘুটঘুটে আঁধারে
আমরা খুলি চোখ,
—যত লাল চোখ।

বুকে বসাই নোখ,
রক্তে গিলি ঢোক।
হাড় ভাঙি আর ঘাড় ভাঙি
আর দিই কোপ
ঝোপ বুঝে কোপ।
আঁদাড়ে কোপ, পাঁদাড়ে কোপ।

"চোপ চোপ" বলে হুতুম সবাইকে থামিয়ে গম্ভীর সুরে আঁধারের স্তুতি আওড়ালেন, "নিঝুম রাত, দুপুর রাত, নিশুতি রাত। কেষ্ট পক্ষের কষ্টি পাথর কালো আকাশের কালো রাত। বর্ষাকালের কাজল মাখা পিছল রাত। নিখুঁত রাত। কালোর পরে একটি খুঁত তারার টিপ। ভয়ংকরী নিশীথিনী, বিরূপা ঘোর, ছায়ার মায়া, থাকুন, তিনি রাখুন। নিশাচর নিশাচরী রক্তপাত করি, আচম্বিতে নিঝুম রাতে, দুপুর রাতে। নষ্টচন্দ্র, ভ্রষ্ট তারা, ভিতর-বার অন্ধকার-রাত সারারাত। নিঝুম দুপুর, নিখুঁত দুপুর, অফুর রাত।"

হুতুম পেঁচা চুপ করলেন। খানিক চারি দিক যেন গমগম করতে লাগল, কারু সাড়াশব্দ নেই, অন্ধকারে কেবল ছুঁচোর খুসখাস আর বেড়ালের গা-চাটার চটচট শোনা যেতে লাগল। পাকুড়তলায় এত বড়ো গম্ভীর মজলিস কোনোদিন বসে নি।

এইবার বয়েসে সবার বড়ো চিলে পেঁচার পালা। সে চড়া গলায় চীৎকার করে শুরু করলে, "ভাই সব।" সব জ্বলন্ত চোখগুলো অমনি চিলের দিকে ফিরল। "ভাই সব, আমরা আজ এই কতকালের পুরনো মিসকালো পাকুড়তলায় ঘুটঘুটে আঁধারে কেন এসেছি জান? খুন খুন খুন করতে, এ আমি চেঁচিয়েই বলব। কিসের ভয়। কাকে ভয়।" তার পর একেবারে নবমে গলা চড়িয়ে চিলে বললে, "ভয় করব না, চেঁচিয়েই বলি, কুঁকড়োটা চো-ও-ও-র", ব'লেই বুড়ো চিলের গলা ভেঙে গেল, সে খক খক করে কাসতে লাগল, আর অন্য সব পেঁচা চেঁচাতে থাকল, "চোর। ডাকাত। সিঁদেল। বদমাশ। আমাদের সর্বস্ব নিলে।"

চড়াই অমনি বলে উঠল, "কী নিলে শুনি।"

"আমাদের আনন্দ, আমাদের তেজ সবই হরণ করছে জান না?" ব'লে পেঁচাগুলো চড়াইয়ের

দিকে কটমট করে চাইতে লাগল।

চড়াই একটু দূরে সরে একটা বাঁশঝাড়ে বসে শুধলে, "তোমাদের তেজ কেমন করে হরণ করলে সে।"

"কেন, গান গেয়ে। তার সুর শুনলেই আমাদের দুঃখু আসে, বেদনা বোধ হয়; সব পেঁচারই মন খারাপ হয়ে যায়, কেননা তার সাড়া পেলেই মনে পড়ে।"

"আলো আসছে।" ব'লেই চড়াই সট করে বাঁশঝাড়ে লুকল। হুতুম রেগে চড়াইকে বললে, "চুপ। খবরদার, ও জিনিসের নাম আর কোরো না, ও নাম শুনলেই রাত্রির মন চঞ্চল হয়ে যেন পালাই পালাই করতে থাকে।"

চড়াই বেরিয়ে এসে বললে, "আচ্ছা না-হয় দিন আসছে বলা যাক।"

অমনি সব পেঁচা শিউরে উঠে চারি দিকে "উঁ আঁ" করতে লাগল আর কানে ডানা ঢেকে বিকট মুখ করে বলতে লাগল, "থামো, থামো, চুপ, চুপ।" চড়াই আবার লুকিয়ে পড়ল, পেঁচাদের বিকট চেহারা দেখে তার একটু ভয় হল। হুতুম খানিক ভেবে বললে, "বলো-না বাপু, যা আসবার তা আসছে।" চড়াই বললে, "যাক ও কথা, যা আসবার তা তো আসবেই, কেউ তো ঠেকাতে পারবে না।"

হুতুম বললে, "তা তো জানি, কিন্তু আসবার আগে তার নাম কেন সে কুঁকড়ো করে বলো তো? তার কাঁসির মতো গলা শুনলেই সেই শেষ রাতের কথাই যে মনে আসে।"

"ঠিক, ঠিক, সত্যি, সত্যি।" সব পেঁচাই বলে উঠল। দিনের কথা মনে করতেও তাদের বিষম কষ্ট হচ্ছিল।

হুতুম বললে, "রাত যখন পোহাবার দিকেই যায়নি, তখন থেকেই পাজি কুঁকড়োটা গান শুরু করে···।"

সবাই অমনি বলে উঠল, "ডাকু হ্যায়। চোট্টা হ্যায়।" হুতুম আবার বললে, "বাকি রাতটুকু সে একেবারে কাঁচা-ঘুম ভাঙিয়ে মাটি করে দেয়।" চারি দিক থেকে অমনি চেঁচানি উঠল, "মাটি। মাটি। একেবারে মাটি। নেহাত মাটি।" তার পর একে একে সবাই আপনার আপনার দুঃখু জানাতে লাগল। ধুঁধুল বললে, "খরগোশের গর্তর কাছে খানিক বসতে না বসতে কুঁকড়োটা

ডাক দেয় আর অমনি আমায় সরতে হয়।" কাল পেঁচা বললে, "পেটের খিদে ভালো করে মেটাবার জো নেই সেটার জ্বালায়।" কেউ বললে, "তাঁর সাড়া কানে এলেই আর মাথা ঠিক রাখতে পারি নে, এটা করতে ওটা করে ফেলি। খুন করতে হয় মশায় তাড়াতাড়ি। যেন আমারি দায় পড়েছে। জখমগুলোও যে একটু শক্ত করে বসাব তার সময় পাই নে মশায়। যতটুকু মাংস দরকার তার বেশি একটু কি সংগ্রহ করবার জো আছে ওটার জ্বালায়। ওর গলাটা শুনলেই দেখি যেন অন্ধকার দেখতে-দেখতে ফিকে হচ্ছে, আর আমি ভয়ে একেবারে কেঁচো হয়ে যাই।"

চড়াই শুনে শুনে বললে, "আচ্ছা সব দোষ কি কুঁকড়োর। এ-পাড়া ও-পাড়ায় আরো তো অনেক মোরগ আছে যারা ডেকে থাকে।"

হুতুম বললে, "তাদের গানকে আমরা ভয় করি নে। ওই কুঁকড়োর ডাকটাই যত নষ্টের গোড়া, সেইটেই বন্ধ করা চাই।"

সবাই অমনি চেঁচিয়ে উঠল, "বন্ধ হোক। বন্ধ হোক। চাই বন্ধ করা চাই।" আর ডানা বাজাতে লাগল। গোলমাল একটু থামলে গো-পেঁচা বললে, "তা যাই বল, চড়াই আমাদের জন্যে অনেক করেছেন।" চড়াই ভয় পেয়ে বললে, "কী, কী, আমি আবার বললেম কী, ও আবার কেমন কথা?" খুদে পেঁচা বললে, "কুঁকড়োর নিন্দে রটিয়ে তার নকল দেখিয়ে তামাশা করে।" অমনি দেউলে, দালানে, গুড়গুড়ে, গোয়ালে, গেছো, জংলা, পাহাড়ে সব পেঁচা হাসতে লাগল "হুঃ হুঃ, ঠিক ঠিক, বাঃ বাঃ, ঠিক ঠিক, হু হু হু হু, হু-উ-উ, খুব ঠিক খুব ঠিক।"

হুতুম রোঁয়া ফুলিয়ে পাখা ঝাপটালে, "বস্-স্-স।" অমনি সব চুপ হয়ে গেল। চিলে পেঁচা গলা কাঁপিয়ে চিঁ চিঁ করে বললে, "তার নিন্দেই রটাও আর নকলই দেখাও সে তো তাতে থোড়াই ডরায়। বেপরোয়া সে গান গেয়ে চলে, আর বেকার আমরা কেঁপেই মরি। এই দেখো-না সাজগোজ হীরে-জহরতের দিক দিয়ে দেখলে ময়ূরের সামনে কুঁকড়োটা দাঁড়াতেই পারে না, কিন্তু তবু তার গান, সে তো এখনো আমাদের জ্বালাতে ছাড়ছে না।" সব পেঁচা বিকট চীৎকার করতে থাকল, "ধরো কুঁকড়োকে। মারো কুঁকড়োকে, ধুমাধুম ধুমাধুম।"

হুতুম চটপট ডানা ঝেড়ে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে সবাইকে বললে, "থামো থামো শোনো শোনো,

এ্যটেন-সা-ন্ অ-ব-ধা-ন।” অমনি সব পেঁচা ডানা ছড়িয়ে গোল চোখগুলো পাকিয়ে স্থির হয়ে বসল, এমনি গম্ভীর হয়ে যে, রাতটাও মনে হতে লাগল যেন কত বড়ো, কত-না গভীর। ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে থেকে লক্ষ্মী পেঁচা আস্তে আস্তে বললে, “তাকে মারা তো হয় না। যে সময়ে সে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ায় সে সময় আমরা দেখতেই পাই নে, চোখে সব যে বোধ হয় ধোঁয়া আর ধাঁধাঁ— ধাঁ-ধাঁ ধাঁ।” ব’লেই লক্ষ্মী পেঁচা চুপ করলে, আর সব পেঁচা গুমরোতে থাকল।

তখন পাকুড়গাছের আগডালের উপর থেকে কুটুরে পেঁচা মিহি আওয়াজ দিলে, “বোলুঙ্গা কুছ, সল্লা হ্যায় কুছ।” হুতুম উপর দিকে চেয়ে বললে, “শুনি, তোমার মতলবটা কী।” কুটুরে সট করে নীচের ডালে নেমে বসে আরম্ভ করলে, “পাহাড়ের ওদিকটায় একটা লোক অদ্ভুত সব পাখির চিড়িয়াখানা বানিয়েছে, নানা দেশী-বিদেশী মোরগ, নানা জাতের নানা কেতার ধরা আছে। ময়ূর যিনি রাজ্যের অদ্ভুত পাখির খবর রাখেন, তিনি কুঁকড়োকে কিছুতে দেখতে পারেন না, কেননা, ময়ূরের একটিমাত্র বৈ দুটি সুর নেই, তাও আবার কর্ণকুহর ভেদ করা ছাড়া আর কিছু করতে পারে না। কিন্তু কুঁকড়োর ডাক, সে সোজা অন্ধকারের বুকে গিয়ে বেঁধে আর তার পর যে কাণ্ডটা ঘটে তা কারুর জানতে বাকি নেই। কাজেই ময়ূর স্থির করেছেন চিনে-মুরগির কুলতলার মজলিসে তিনি এই-সব অদ্ভুত মোরগদের হাজির করবেন।” “চিনে-মুরগির সঙ্গে আলাপ করে দিতে বুঝি?” ব’লেই সব পেঁচা হোঁ হোঁ করে হাসতে থাকল।

কুটুরে বললে, “এই-সব অদ্ভুত মোরগের কাছে কি কুঁকড়ো দাঁড়াতে পারবে। একেবারে খাড়া দাঁড়িয়ে মাটি হবে।” গোয়ালে পেঁচা বলে উঠল, “হাজির তারা হবে কেমন করে। খাঁচা না খুলে দিলে তো সেই-সব খাসা মোরগদের এক পা নড়বার সাধ্যি নেই।”

কুটুরে সবাইকে আশ্বাস দিয়ে বললে, “তারও উপায় করা গেছে। যে পাহাড়ী ছোঁড়াটা খাঁচা খুলে সকালে তাদের দানাপানি খাওয়ায় সে কাল যেমন খাঁচা খুলবে আর আমি অমনি তার মুখে গিয়ে ডানার এক ঝাপটা দেব। নিশ্চয়ই সে কাঁদতে কাঁদতে দৌড় দেবে খাঁচা খোলা রেখে। পেঁচার বাতাস গায়ে লাগলেই অসুখ, সেটা জানো তো। তার পর সব মোরগকে নিয়ে সরে পড়ো আর কি।”

চড়াই বললে, “ওদিকে কুঁকড়ো বলছেন যে তিনি মজলিসে মোটেই যেতে রাজি নন।”

বেড়াল বললে, "যাবে না কী। নিশ্চয়ই যাবে। দেখ নি সোনালিয়া মুরগিটির সঙ্গে তার কত ভাব। আমি এই লিখে দিচ্ছি সোনালিয়া কুঁকড়োকে মজলিসে হাজির করবেই কাল।" চড়াই বুঝলে কালো বেড়ালটা সারাদিন ঘুমোয় বটে, কিন্তু কোথা কী হয় সেটুকুও দেখে শোনে, গোলাবাড়ির সব খবরই সে রাখে চোখ বুজে বুজেই।

চড়াই বললে, "হাজির যেন হলেন কুঁকড়ো, তার পর?"

"তার পর আর কী। কুঁকড়ো যখন দেখবেন পাড়ার সবাই অদ্ভুত সব মোরগদের খাতির করতেই ব্যস্ত, এমন-কি, হয়তো সোনালি পর্যন্ত, জেনে রেখো তখন খুঁটিনাটি বাধবেই আর তা হলেই—"

"কুঁকড়োর লড়াই না হয়ে যায় না।" বলেই হুতুম ঠোঁটে ঠোঁট বাজিয়ে দিলেন। কিন্তু বেড়াল বললে, "ধরো লড়ায়ে কুঁকড়োর হার না হয়ে জিতই হয়ে গেল ফস করে। তখন উপায়?"

কুটুরে অমনি বললে, "সে ভাবনা নেই, ওই-সব খাসা মোরগদের মধ্যে যে বাজখাঁই পালোয়ান মোরগ আছে তাকে পারে এমন কেউ দেখি নে। মানুষ তার পায়ে লোহার কাঁটা-দেওয়া যে কাতান বেঁধে দিয়েছে তার এক ঘা খেলে কুঁকড়োকে আর দেখতে হবে না, একেবারে চিৎপটাং।" ব'লে কুটুরে হাসতে লাগল। সঙ্গে সব পেঁচাই ধাই ধাই করে নাচতে থাকল।

হুতুম বললে, "আমি তো বাপু আগে গিয়ে তার মাথার মোরগ ফুলটা ছিঁড়ে খাব, কপা কপ্ কপা কপ্।"

চড়াই মনে মনে বললে, "গতিক তো খারাপ দেখছি। কুঁকড়োকে খবর দেব নাকি।" কিন্তু চেঁচিয়ে সে সবাইকে বললে, "বেশ হবে, খুব হবে, ভালোই হবে, কী বল।"

কুটুরে বললে, "মজা ব'লে মজা। খাসা মোরগগুলোও দু-চারটে মরবে নিশ্চয়। পেট ভরে খাও; সেগুলো কি নষ্ট করা ভালো।"

হুতুম চিলের কানে-কানে বললে, "কুঁকড়োর কাবারের পর দুজনে মিলে, বুঝেছ কিনা, চড়াই ভাতি···" আর তার পরে ধুঁধুলে পেঁচা কী বলতে যাচ্ছে এমন সময় দূরে কুঁকড়োর সাড়া পড়ল, "গা-তোল্-তোল্।" পেঁচারা শুনলে, "পটোল তোল্।" অমনি ভয়ে সব

চুপ। কুটুরে ক্রমেই মাথা হেঁট করতে লাগল। কে যেন তার ঘাড় ধরে মাটিতে মুখ ঘষে দিতে চাচ্ছে। এতক্ষণ পেঁচা-সব রোঁয়া ফুলিয়ে বিকট চেহারা করে বসে ছিল, দেখতে দেখতে ফুটো রবারের গোলার মতো চুপসে গেল, যেন কতদিন খায় নি। মুখে কারু কথা সরছে না, কেবল চোখ পিটপিট করে এ ওকে শোধাচ্ছে, "হল কী। কী ব্যাপার।" তার পর ডানা মেলে একে একে সবাই পালায় দেখে চড়াই বললে, "এরি মধ্যে চললে নাকি।" চড়ায়ের কথা কে-ইবা শোনে। চড়াই যত বলে, "ভোর হতে এখনো দেরি, চলুক না ঘোঁট আরো খানিক।" সব পেঁচা চোখ পিটপিট করে বলে, "না না না, আর না, আর না, আর না।" হুতুম বললে, "গেলুম।" ধুঁধুল বললে, "মলুম।" "বাঁচাও বাঁচাও।" বলছে আর-সব পেঁচাগুলো। তাড়াতাড়িতে কোথায় যাবে, কী করবে ঠিক পাচ্ছে না, কানার মতো কখনো কাঁটা-গাছে গিয়ে পড়ছে, কখনো পাথরে টক্কর খাচ্ছে। আর ডানা দিয়ে চোখ-মুখ ঘষছে আর বলছে, "উঃ গেছি। উঃ গেছি।" "লাগছে লাগছে।" বলতে বলতে একে একে সব পেঁচা চম্পট দিলে। সব-শেষ হুতুম পেঁচাটা "গেলুম। গেলুম।" বলতে বলতে উড়ে পালাল।

চড়াই দেখলে অন্ধকারের মধ্যে কালো কালো নৌকার মতো দলে-দলে পেঁচা গ্রাম ছাড়িয়ে ক্রমে পাহাড়ের গায়ে মিলিয়ে গেল। আর কেউ কোথাও নেই, পাকুড়তলা সে একা রয়েছে। "ফজর তো হল এখন ছোটো হাজরির জন্যে একটা গঙ্গা ফড়িং পেলে হয় ভালো।" ব'লে চড়াই এদিক ওদিক করছে, এমন সময় একটা ঝোপের আড়াল থেকে ঝপ করে সোনালিয়া বেরিয়ে এল। চড়াই অবাক হয়ে বললে, "একি। এত রাত্রে আপনি এখানে।"

সোনালিয়া একটু দূরে থেকে পেঁচাদের যুক্তি সমস্ত শুনেছিল, সে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, "কী ভয়ানক ব্যাপার, চড়াই তো কুঁকড়োর বন্ধু, এখন বন্ধুকে বাঁচাতে চেষ্টা তো তার করা উচিত।" চড়াই আবার ফড়িং-এর সন্ধান করতে করতে বললে, "পেঁচা ভাজা খেতে কী মজা তা পাখিজন্মে তারা কেউ জানলে না—।"

সোনালিয়া অবাক হল। চড়াইটার রকম দেখে সে রেগে বললে, "কথার জবাব দাও-না।" "কীঃ।" ব'লেই চড়াই ফিরে দাঁড়াল। সোনালি শুধলে, "ঘোঁটের খবর জানতে চাচ্ছি।" চড়াই ধীরে সুস্থে উত্তর করলে, "ঘোঁটটা খুব চলেছিল, সব দিকেই ভালো।"

সোনালি চড়াই-এর হেঁয়ালির অর্থ বুঝলে না ; সে পরিষ্কার জবাব চাইলে। চড়াই বললে, "অন্ধকার বেশ ঘুটঘুটে আর পেঁচাগুলোও বেশ মোটা-সোটা দেখলেম।"

"তারা তাঁকে মারবার যুক্তি করলে ?" সোনালি শোধালে।

"নাঃ, মারবার নয় তাকে পরলোকে পাঠাবার যুক্তি।" ব'লে চড়াই সোনালিকে আশ্বাস দিয়ে বললে, "তবু কতকটা রক্ষে, কী বলো।" সোনালি কি বলতে যাচ্ছিল, চড়াই বললে, "ভাবছ কেন, শেষ দাঁড়াবে যা তা ফক্কাঃ, বুঝলে।" সোনালি ভয়ে ভয়ে বললে, "যাই বল কিন্তু পেঁচারা তো সহজ পাখি নয়।"

চড়াই হেসে বললে, "কিন্তু তাদের যুক্তিটা মোটেই ভয়ানক নয়। আরো অনেক যুক্তি তারা এঁটেছে আঁটবেও। পেঁচাগুলো যদি সহজ পাখি হত তবে ঘুঁট না করে খাবার ঘুঁটেই তারা বেড়াত। কিন্তু তাদের ভুরু চোখের উপরে, নীচে, আশে পাশে, আর চোখগুলো দেখেছ তো ? মনে হয় যেন পাহারোলার লণ্ঠন, খোলো আর বন্ধ করো। আর ঠোঁট তো দেখেছ ?" ব'লেই চড়াই "ছিঃ ছিঃ।" বলে ডানা ঝাড়া দিয়ে বললে, "তুমি কিছু ভেবো না সোনালি। সব ঠিক হবে, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা চাই, বুঝলে কিনা।"

সোনালি চড়াই-এর হেঁয়ালি বড়ো একটা বুঝলে না কিন্তু কুঁকড়োর পুরনো বন্ধু হয়ে চড়াই এখনো যখন হাসিতামাশা করছে তখন ভয়ের কারণ খুবই কম এটা তার মনে হল। "কিন্তু তবু কী জানি, কুঁকড়োকে সব কথা জানানো ভালো।" ব'লে সোনালি গোলাবাড়ির দিকে যাবে, চড়াই তাকে তাড়াতাড়ি পথ আগলে বললে, "অমন কাজটি কোরো না, যদি-বা কুঁকড়ো সেখানে না যান, এই ঘোঁটের কথা শুনলে নিশ্চয়ই যাবেন, আর তা হলে লড়াই বাধবেই।" সোনালি চড়ায়ের কথা রাখলে। চড়াই যখন তাঁর পুরনো বন্ধু, তখন তারি পরামর্শমত কাজ করাই ঠিক। সোনালি যাচ্ছিল, ফিরে এল।

ওদিক থেকে শব্দ এল, "গা তো ল্।" চড়াই আর সোনালি ফিরে দেখলে কুঁকড়ো আসছেন। কুঁকড়ো হাঁক দিলেন, "কো-উ-ন হ্যায়।"

সোনালি মিহিসুরে উত্তর দিলে, "সো-না-লি-য়া", কুঁকড়ো শোধালেন, "ওখানে আর কেউ আছে কি।" সোনালি চড়াইকে চোখ টিপে বললে, "না মশায়।" ঘোঁটের কথা কুঁকড়োকে

যেন বলা না হয় সোনালিকে সে বিষয়ে সাবধান করে দিয়ে, চড়াই আস্তে আস্তে বাবলা গাছের তলায় একটা খালি ফুলের টবের আড়ালে গিয়ে লুকোল।

৫

কুঁকড়ো নিজে যেমন, তেমনি কাউকে ভোরে উঠতে দেখলে ভারি খুশি। সোনালিয়াকে দেখে বললেন, "বাঃ তুমি তো খুব সকালে উঠেছ। বেশ, বেশ।" কিন্তু সোনালিয়া চিনে-মুরগির চা-পার্টিতে যাবার জন্যেই খালি আজ এত সকালে বিছেনা ছেড়ে বেরিয়েছে শুনে কুঁকড়ো ভারি দমে গেলেন। কুঁকড়ো পষ্ট বললেন, তিনি ওই চিনে-মুরগিটাকে চু'চক্ষে দেখতে পারেন না। কিন্তু সোনালিয়া ছাড়বার নয়, সে তবু কুঁকড়োকে চিনে-মুরগির মজলিসে যেতে পেড়াপিড়ি করে বললে, "দেখি তুমি আমার কথা রাখ কি না।"

কুঁকড়ো তবু যেতে রাজি নয়, তখন সোনালিয়া অভিমান করে বললে, "তবে আমি এখনি বাড়ি চলে যাই।" কুঁকড়ো তাড়াতাড়ি বলে ফেললেন, "না সোনালি, এখনি যেয়ো না।" সোনালি অমনি সুযোগ বুঝে বললে, "তবে যাবে বলো চিনি-দিদির বাড়িতে।" কুঁকড়ো কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "আচ্ছা তাই, আমিও যাব।" কথাটা ব'লেই কুঁকড়ো মনে মনে নিজের উপর খুব চটলেন, মেয়েরা যা আবদার করবে, তাই কি মানতে হবে।

সোনালি কুঁকড়োর ভাব বুঝে মনে মনে হাসতে লাগল। কুঁকড়োকে চিনি-দিদির বাড়িতে নিয়ে যেতে সে খুব ব্যস্ত ছিল না ; সে কুঁকড়োর কাছ ঘেঁষে বললে, "তোমার সেই মন্তরের কথাটি বলো-না শুনিই-ই—।"

কুঁকড়ো একটু গম্ভীর হলেন, সোনালি বললে, "বলো-না, বলোবলো, বলো-না।"

কুঁকড়ো এবারে গদগদস্বরে "সোনালি আমার মনের কথাটি" বলে আবার চুপ করলেন। সোনালি বলে চলল, "বনের মধ্যে বসন্তকালের চাঁদনিতে সারারাত কাটিয়ে একলাটি আমি বনের ধারে এসে দাঁড়িয়েছি, সকালের আলো আকাশে ঝিলিক দিয়ে উঠল, আর অমনি শুনলেম, তোমার ডাক দূর থেকে আসছে, যেন দূরে কার বাঁশি বাজছে।"— বনের রানী

সোনালিয়া পাখি সকালের সোনার আলোতে একলাটি দাঁড়িয়ে কান পেতে তাঁর গান শুনছে একমনে, এ খবর পেয়ে কোন্ গুণীর না মনটা নরম হয়। কুঁকড়ো ঘাড় হেলিয়ে ভাবতে লাগলেন, 'বলি কি না বলি।' সোনালিয়া মিঠে সুরে আরম্ভ করলে রূপকথা, "এক যে ছিল কুঁকড়ো আর যে ছিল বনের টিয়া।" কুঁকড়ো ভুল ধরলেন, "হল না তো হল না তো।" তার পর নিজেই রূপকথার খেই ধরলেন, কুঁকড়োর পিয়া ছিল সোনালিয়া, বনবাসিনী বনের টিয়া।" সোনালিয়া বলে উঠল, "কুঁকড়ো টিয়াকে কখনো বললে না রূপকথার নিতিটুকু", বলতেই কুঁকড়ো সোনালিয়ার কাছে এসে বললেন, "জানো, সে কথাটা কী? যেটা বনের টিয়েকে কুঁকড়ো বলতে সময় পেলে না? কথাটা হচ্ছে, তোমার সোনার আঁচল বসন্তের বাতাস দিয়ে গেল সোনালিয়া বনের টিয়া।" সোনালি গম্ভীর হয়ে বললে, "কী বকছেন আপনি। রূপকথা শোনাতে হয় তো আপনার চার বউকে শোনান গিয়ে, খুশি হবে", ব'লেই সোনালি অন্য দিকে চলে গেল।

কুঁকড়ো রেগে গজ গজ করে ঘুরে বেড়ান, অনেকক্ষণ পরে সোনালি আস্তে আস্তে কুঁকড়োর কানের কাছে মুখ নিয়ে বললে, "একটা গান গাও-না।" কুঁকড়ো ফোঁস করে উঠলেন, সোনালি বললে, "বাসরে, একে বুঝি বলে গান!" তখন মিষ্টি সুরে কুঁকড়ো ডাকলেন, "সো-ও-ও-ন্", যেন শ্যামা পাখি সিটি দিলে, সোনালি অমনি আবদার ধরলেন, কুঁকড়োর গুপ্ত মন্তরটি শোনবার জন্যে। কুঁকড়ো খানিক এদিক ওদিক করে বললেন, "সোনালি, তুমি বাইরে যেমন খাঁটি সোনার বুকের ভিতরটাও যদি তেমনি তোমার খাঁটি হয় তবে তোমায় আমার গোপন কথাটি শোনাতে পারি", ব'লে সোনালির মুখের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে যেন শুনতে লাগলেন, সোনালির বুকের মধ্যে থেকে ডাক আসছে কি না, 'বলো বলো।' তার পর কুঁকড়ো আরম্ভ করলেন, "সোনালি পাখি, বুঝে দেখো আমি কী, সোনার শিঙার মতো বাঁকা আমি বাজবার জন্যেই সৃষ্টি হয় নি কি জীবন্ত এক রৌশন-চৌকি? জলের উপরে যেমন রাজহাঁস, তেমনি সুরের তরঙ্গে ভেসে বেড়াতেই আমার জন্ম, আমি চলেছি সুরের বোঝা শব্দের ভার বয়ে সোনার একটি মউরপঙখি, সকাল-বিকাল।"

সোনালিয়া বলে উঠল, "নৌকোর মতো ভেসে বেড়াতে তো তোমায় কোনোদিন দেখি নি,

মাটি আঁচড়াতে প্রায়ই দেখি বটে।"

কুঁকড়ো বললেন, "মাটি আঁচড়াবার অর্থ আছে। তুমি কি মনে কর, আমি মাটি আঁচড়াই মাসকলাই সংগ্রহ করতে। সে করে মুরগিরা, আমি মাটি আঁচড়ে দেখি, কোন্ মাটি আমার উপযুক্ত দাঁড়াবার বেদী হতে পারে। আমি জানি, গান গাওয়া মিছে হবে যদি না ইট-পাটকেল ঘাস কুটো কাঁটা সব সরিয়ে এই পুরানো পৃথিবীর কালো মাটির পরশখানি নিতে ভুলি। পৃথিবীর বুকের খুব কাছে দাঁড়িয়ে মাটির সঙ্গে নিজেকে একেবারে মিলিয়ে তবে আমি গান করি। সোনালিয়া, প্রায় সবই তো শুনলে, আরো যদি জানতে চাও তো বলি, আমাকে সুর খুঁজে খুঁজে তো গান গাইতে হয় না, সুর আপনি ওঠে আমার মধ্যে, মাটি থেকে লতায় পাতায় রস যেমন ক'রে উঠে আসে, গানও তেমনি করে আমার মধ্যে ছুটে আসে আপনি, জন্মভূমির বুকের রস। পুব আকাশের তীরে সকালটি ফুটি-ফুটি করছে, ঠিক সেই সময় আমার মধ্যে উথলে উঠতে থাকে সুর আর গান, বুক আমার কাঁপতে থাকে তারি ধাক্কায়, আর আমি বুঝি, আমি না হলে সরস মাটির এই সুন্দর পৃথিবীর বুকের কথা খুলে বলাই হবে না। সকালের সেই শুভ লগ্নটিতে মাটি আর আমি যেন এক হয়ে যাই, মাটির দিকে আমি আপনাকে নিয়ে যাই, আর পৃথিবী আমাকে সুন্দর শাঁখের মতো নিজের নিশ্বেসে পরিপূর্ণ করে বাজাতে থাকে, আমার মনে হয় তখন আমি যেন আর পাখি নই, আমি যেন একটি আশ্চর্য বাঁশি, যার মধ্যে দিয়ে পৃথিবীর কান্না আকাশের বুকে গিয়ে বাজছে।

"অন্ধকারের মধ্যে থেকে ভোর রাতের হিম মাটি এই যে কাঁদন জানাচ্ছে, আকাশের কাছে তার অর্থ কী সোনালিয়া, সে আলো ভিক্ষে করছে, একটুখানি সোনার আলো-মাখা দিন তারি প্রার্থনা, ভোর বেলার সবাই কাঁদছে, দেখবে, আলো চেয়ে, গোলাপের কুঁড়ি সে অন্ধকারে কাঁদছে আর বলছে, আলো দিয়ে ফোটাও। ওই যে খেতের মাঝে একটা কাস্তে চাষারা ভুলে এসেছে, সে ভিজে মাটিতে প'ড়ে মরচে ধ'রে মরবার ভয়ে চাচ্ছে আলো, একটু আলো এসে যেন রামধনুকের রঙে চারি দিকের ধানের শিষ রাঙিয়ে দেয়।

"নদী কেঁদে বলছে, আলো আসুক, আমার বুকের তলা পর্যন্ত গিয়ে আলো পড়ুক। সব জিনিস চাচ্ছে যেন আলোয় তাদের রঙ ফিরে পায়, আপনার আপনার হারানো ছায়া ফিরে

পায়, তারা সারারাত বলছে, আলো কেন পাচ্ছি নে, আলো কী দোষে হারালেম।

"আর আমি কুঁকড়োঁ তাদের সে কান্না শুনে কেঁদে মরি, আমি শুনতে পাই ধান খেত সব কাঁদছে, শরতের আলোয় সোনার ফসলে ভরে ওঠবার জন্যে, রাঙা মাটির পথ সব কাঁদছে, যারা চলাচল করবে তাদের ছায়ার পরশ বুকের উপর বুলিয়ে নিতে আলোয়। শীতে গাছের উপরের ফল আর গাছের তলার গোল গোল নুড়িগুলি পর্যন্ত আলো তাপ চেয়ে কাঁদছে, শুনি। বনে বনে সূর্যের আলোক কে না চাচ্ছে বেঁচে উঠতে জেগে উঠতে, কে না আলোর জন্যে সারা রাত কাঁদছে। এই জগৎসুদ্ধ সবার কান্না আলোর প্রার্থনা এক হয়ে যখন আমার কাছে আসে তখন আমি আর ছোটো পাখিটি থাকি নে, বুক আমার বেড়ে যায়, সেখানে প্রকাণ্ড আলোর বাজনা বাজছে শুনি, আমার দুই পাঁজর কাঁপিয়ে তার পর আমার গান ফোটে, "আ-লো-র ফুল"। আর তাই শুনে পুবের আকাশ গোলাপী কুঁড়িতে ভরে উঠতে থাকে, কাকসন্ধ্যার কা কা শব্দ দিয়ে রাত্রি আমার গানের সুর চেপে দিতে চায়, কিন্তু আমি গেয়ে চলি, আকাশে কাগডিমে রঙ লাগে তবু আমি গেয়ে চলি আলোর ফুল, তার পর হঠাৎ চমকে দেখি আমার বুক সুরের রঙে রাঙা হয়ে গেছে আর আকাশে আলোর জবাফুলটি ফুটিয়ে তুলেছি আমি পাহাড়তলির কুঁকড়ো।"

সোনালি অবাক হয়ে বললে, "এই বুঝি তোমার মন্তর।"

"হাঁ, সোনালি, মন্তরটা আর কিছু নয়, আমি না থাকলে পুব আকাশে সব আলো ঘুমিয়ে থাকত এই বিশ্বাসটা আমি করতে পেরেছি এইটুকুই আমার ক্ষমতা, তা একে মন্তরই বলো বা তন্তরই বলো কিংবা অন্তরই বলো", ব'লে কুঁকড়ো এমনি ঘাড় উঁচু ক'রে বুক ফুলিয়ে দাঁড়ালেন যে মনে হল যেন তিনি বলছেন— 'ঘাড় হেঁট হয় এমন কাজ আমি করি নে, আমি নিজের গুণগান করে বেড়াই নে, আমি আলোর জয়-জয়কারই দিই, আমি জোরে গাই নিজের গলার রেশ নিজে শোনবার জন্যে নয়, আমি জোরে গাই আলোতে সব পরিষ্কার হয়ে ফুটবে ব'লে।' কুঁকড়ো যতক্ষণ ব'লে চলেছিলেন ততক্ষণ সোনালি সব ভুলে তাঁর কথাই শুনছিল, এখন কুঁকড়ো চুপ করতে তার চটকা ভেঙে গেল, কুঁকড়োর কথায় তার অবিশ্বাস হল ; সে বলে উঠল, "একি পাগলের কথা! তুমি, তুমি ফুটিয়ে দাও আকাশে…"

"সেই জিনিস যা চোখের পাতা মনের দুয়ারে এসে ঘুমের ঘোমটা খুলে দেয়। আকাশ যেদিন মেঘে ঢাকা, সেদিন জানব, আমি ভালো গাই নি।"

"আচ্ছা, তুমি-যে দিনের বেলাও থেকে থেকে ডাক দাও, তার অর্থটা কী শুনি।" সোনালি শুধল।

কুঁকড়ো বললেন, "দিনের বেলায় এক-একবার গলা সেধে নিই মাত্র। আর কখনো-বা ওই লাঙলটাকে নয়তো কোদালটাকে ওই ঢেঁকি ও ওইখানে ওই কুড়ুল এই কাস্তেকে বলি, ভয় নেই, আলোকে জাগিয়ে দিতে ভু-ল-ব-না ভু-ল-ব-না।"

সোনালি বললে, "ভালো, আলোকে যেন তুমি জাগালে, কিন্তু তোমাকে ঠিক সময়ে জাগিয়ে দেয় কে, শুনি?"

"পাছে ভুল হয়, সেই ভয়েই আমি জেগে উঠি।"

কুঁকড়োর জবাব শুনে সোনালির তকরার করবার ঝোঁক বাড়ল বৈ কমল না; সে বললে, "আচ্ছা, তুমি কি মনে কর, সত্যি তোমার গানে জগৎ জুড়ে আলোর বান ডাকে?"

কুঁকড়ো বললেন, "জগৎ জুড়ে কী হচ্ছে তার খবর আমি রাখি নে, আমি কেবল এই পাহাড়-তলিটির আলোর জন্য গেয়ে থাকি, আর আমার এই বিশ্বাস যে এ-পাহাড়ে যেমন আমি ও-পাহাড়ে তেমনি সে, এমনি এক-এক পাহাড়তলিতে এক-এক কুঁকড়ো রোজ রোজ আলোকে জাগিয়ে দিচ্ছে।" সোনালির সঙ্গে কথা কইতে রাত ফুরিয়ে এল। কুঁকড়ো দেখলেন, সকালের জানান দেবার সময় হয়েছে, তিনি সোনালিকে বললেন, "সোনালি, আজ তোমার চোখের সামনে সূর্য ওঠাব, আমাকে পাগল ভেবো না, দেখো এবং বিশ্বাস করো। আজ যে গান আমার বুকের মধ্যে গুমরে উঠছে, তেমন গান আমি কোনোদিন গাই নি, গানের সময় আজ তুমি কাছে দাঁড়াবে, আমার মনে হচ্ছে, আজ সকালটি তাই এমন আলোময় হয়ে দেখা দেবে যে তেমন সকাল এই পাহাড়তলিতে কেউ কখনো দেখে নি সোনালিয়া।" বলে কুঁকড়ো ঢালুর উপরে গিয়ে দাঁড়ালেন। নীল আকাশের গায়ে যেন আঁকা সেই কুঁকড়োকে কী সুন্দরই দেখাতে লাগল। সোনালি মনে মনে বললে, 'এঁকে কি অবিশ্বাস করতে পারি।' এইবার কুঁকড়ো সোজা হয়ে দাঁড়ালেন, গায়ের রঙিন পালক ঝাড়া দিয়ে। সোনালি দেখলে, তাঁর মাথার মোরগ-ফুলটা যেন আগুনের শিখার

মতো রগরগ করছে। পুব্ দিকে মুখ করে কুঁকড়ো ডাক দিলেন, "ফ জী-ই-ই-র্ ফ-জী-র্"··· সোনালি শুনলে কুঁকড়ো যেন পুব আকাশকে হুকুম দিলেন, "কাজ শুরু করো", আর অমনি মাটির হুকুম কাজের সাড়া সকালের বাতাসে অনেক দূর পর্যন্ত ছুটে গেল, "ভোর ভয়ি ভো-র ভ-য়ি" হাঁকতে হাঁকতে। তার পর সোনালি দেখলে কুঁকড়ো যেন সব কাদের সঙ্গে কথা কইছেন, "বাদল বসন্তের চেয়ে দুদণ্ড আগে তোমার আলো এনে দেব ভয় নেই।" সোনালি দেখলে তিনি একবার মাটির কাছে মুখ নামিয়ে একবার ও-ঝোপ এ-ঝোপের দিকে মুখ ফিরিয়ে কখনো ঘাসগুলির পিঠে ডানা বুলিয়ে কত কী বলছেন, যেন সবাইকে তিনি অভয় দিচ্ছেন আর বলছেন, "দেব দেব, আলো দেব, রোদ দেব, হিম আঁধার ঘুচবে, ভয় কী ভয় কী।" অণুপরমাণু ধুলোবালি তারা— কুঁকড়োর কানে কানে কী বলে গেল, কুঁকড়ো ঘাড় নেড়ে বললেন, "দোলনা চাই, আচ্ছা, দোলনা দিচ্ছি, সোনার সে দোলনা বাতাসে ঝুলবে, আর অণু পরমাণু মিলে লাগবে ঝুলোন দে দোল দোল, দে দোল দোল।" সোনালি দেখলে আকাশ আর মাটির মধ্যে ঝোলানো পাতলা নীল অন্ধকার একটু একটু দুলছে আর দেখতে দেখতে ভোরের শুকতারা যেন ক্রমে নিভে আসছে। সোনালি বললে, "দিনের আলো দেবার আগে সব তারাগুলোকে বড়ো যে নিভিয়ে দিচ্ছ, এককে নিভিয়ে অন্যকে আলো দেওয়া, এ কেমন?" কুঁকড়ো একটু হেসে বললেন, "একটি তারাও আমি নিভিয়ে ফেলি নি সোনালি, আলো জ্বালাই আমার ব্রত, দেখো এইবার পৃথিবী আলোময় হচ্ছে, রাত্রি দূ-উ-উ-র হল দেখতে দেখতে।" সোনালির চোখের সামনে নীলের উপর হলদে আলো লেগে সমস্ত আকাশ ধানি রঙে সবুজ হয়ে উঠল, মেঘগুলোতে কমলা রঙ আর দূরের পাহাড়ে মাঠে সব জিনিসে কুসুম ফুলের গোলাপী আভা পড়ল। কুঁকড়ো ডাক দিয়ে চললেন, "আলোর ফুল আলোর ফু-ল-কি-ই-ই গোলাপী হোক সোনালি, সোনালি সে রুপোলি, রুপোলি হোক সাদা আ-লো-আ-লো-র ফুল", কিন্তু তখনো দূরে খেতগুলোতে শোন্ ফুলের রঙ মেলায় নি, সব জিনিসে চমক দিচ্ছে, কুঁকড়ো ডাকলেন, 'আ-লো-ও ও", অমনি কাছের খেতের উপরে চট করে এক পোঁছ সোনালি পড়ল, পাহাড়ে ঝাউগাছের মাথায় সোনা ঝকমক করে উঠল। কুঁকড়ো পুব ধারের আকাশকে বললেন, "খুলুক খুলুক।" অমনি আকাশ জুড়ে পুব দিকে আলোর ছড়া পড়তে থাকল। পাহাড়ের দিকে চেয়ে কুঁকড়ো ডাকলেন, "খুলুক খুলুক", অমনি

সব পাহাড়ে পাহাড়ে গোলাপী ফুলে ভরা পদম্ গাছ ছবির মতো খুলে গেল সোনালির চোখের সামনে। "খুলুক খুলুক", দূরে ঝাপসা পাহাড় কুয়াশার চাদর খুলে যেন কাছে এসে দাঁড়াল। দূরের কাছের সব জিনিস ক্রমে পরিষ্কার হয়ে উঠছে, অন্ধকার থেকে আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসছে, নতুন করে আলো-ছায়া দিয়ে গড়া এক টুকরো পৃথিবী। শুকনো ছড়ি থেকে ফলন্ত আমগাছ গড়বার সময় ছেলেরা যেমন সেটার দিকে হাঁ ক'রে চেয়ে থাকে সোনালি তেমনি কুঁকড়োর এই-সব কাণ্ডকারখানা অবাক হয়ে দেখছিল, আর ভাবছিল কুঁকড়োই বুঝি এ-সবের ছিষ্টিকর্ত্তা, এমন সময় কানের কাছে শুনলে, "মোন, বলো ভালোবাস তো ?"

সোনালি খানিক চুপ করে থেকে বললে, "অন্ধকার থেকে এমন সকাল যে উঠিয়ে আনলে, তার সঙ্গে মনের কথা চালাচালি করতে কে না ভালোবাসে।"

কুঁকড়ো বললেন, "সরে এসো সোনালি, বুক তুমি আনন্দে ভরে দিয়েছ, তোমাকে পেয়ে আজ কাজ মনে হচ্ছে কত সহজ" এই ব'লে কুঁকড়ো ডাকলেন, "আলোর ফুলকি সোনালি", সোনালি অমনি কুঁকড়োর একেবারে খুব কাছে এসে বললে, "ভালোবাসি গো ভা-লো-বা-সি।" কুঁকড়ো বললেন, "সোনালিয়া, তোমার সোনালিয়া রূপটি সোনালি কাজলের মতো আমার চোখের কোলে লাগল, তোমার মধুর মতো মিষ্টি আর সোনালি কথা প্রাণের মধ্যেটা সোনায় সোনায় ভরে দিয়েছে। এত সোনা আজ পেয়েছি যে মনে হচ্ছে এখনি ওই সামনের উঁচু পাহাড়টা আমি আগাগোড়া সোনায় মুড়ে দিতে পারি।" সোনালিয়া আদর করে বললে, "দাও-না পাহাড়টা গিলটি ক'রে, আমি তোমাকে রোজ রোজ ভালোবাসব।" কুঁকড়ো হাঁক দিলেন, "সো-না-র জল সো-না-লি-য়া", অমনি পাহাড়ের চূড়োয় সোনা ঝকঝক করে উঠল, তার পর সোনা গ'লে ঢালু বেয়ে আস্তে আস্তে নীচের পাহাড়ের গোলাপীতে এসে মিশল, শেষে গোলাপী ছাপিয়ে একেবারে তলায় মাঠের উপর গড়িয়ে পড়ল। দেখতে দেখতে দূর আর কাছের রাস্তা-ঘাট মাঠ-ময়দান ঘর-দুয়োর গ্রাম-নগর বন-উপবন সোনাময় হয়ে দেখা দিলে। কিন্তু দূরে পাহাড়ের গায়ে এখানে ওখানে নদীর ধারে গাছগুলোর শিয়রে এখনো একটু-আধটু কুয়াশা মাকড়সার জালের মতো জড়িয়ে রয়েছে, ওগুলো তো থাকলে চলবে না, কুঁকড়ো প্রথম আস্তে বললেন, "সাফাই", সোনালি ভাবলে, কুঁকড়ো বুঝি হাঁপিয়ে

পড়েছেন আর বুঝি পারেন্ না গান করতে, কিন্তু একি যে-সে কুঁকড়ো যে কাজ বাকি রেখে যেমন-তেমন সকাল করেই ছেড়ে দেবে, "আরো আলো চাই" ব'লে কুঁকড়ো আবার গা-ঝাড়া দিয়ে এমন গলা চড়িয়ে ডাক দিলেন যে মনে হল বুঝি, তাঁর বুকটা ফেটে গেল, "আলোর ফুল আলোর ফুল, ফু-উ-উ-উল-কি-ই-ই আলো-র-র-র-র"। দেখতে দেখতে আকাশের শেষ তারাটি সকালের আলোর মধ্যে একেবারে হারিয়ে গেল, তার পর দূরে দূরে গ্রামের কুটিরের উপর জ্বলন্ত আখার সাদা ধুঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে সকালের আকাশের দিকে উঠে চলল আস্তে আস্তে। সোনালি তাকিয়ে দেখলে কুঁকড়ো কী সুন্দর। সে সকালের শিল্পী কুঁকড়োকে মাথা নিচু ক'রে নমস্কার করলে। আর কুঁকড়ো দেখলেন, আলোর ঝিকিমিকি আঁচলের আড়ালে সোনালিয়ার সুন্দর মুখ। কুঁকড়ো মোহিত হলেন। আজ তাঁর সকালের আরতি সার্থক হল, তিনি এক আলোতে তাঁর জন্মভূমিকে আর তাঁর ভালোবাসার পাখিটিকে সোনায় সোনায় সাজিয়ে দিলেন। কুঁকড়ো আনন্দে চারি দিকে চেয়ে দেখলেন, কিন্তু তখনো কেন মনে হচ্ছে, কোথায় যেন একটু অন্ধকার লুকিয়ে আছে। তিনি আবার ডাক দিতে যাবেন, এমনি সময় নীচের পাহাড় থেকে একটির পর একটি মোরগের ডাক শোনা যেতে লাগল ; যে যেখানে সবাই সকালের আলো পেয়ে গান গাচ্ছে। আগে আলো হল, পরে এল সব মোরগের গান, কুঁকড়ো কিন্তু সবার আগে যখন আলো ব'লে ডাক দিয়েছেন, তখনো রাত ছিল, তিনি যে সবার বড়ো তাই অন্ধকারের মাঝে দাঁড়িয়ে তিনি আলোর আশা সবাইকে শোনাতে পারেন। আলো জাগানো হল, এইবার সূর্যকে আনা চাই, কুঁকড়ো আবার শুরু করলেন, "রাঙা ফুল আগুনের ফুলকি", অমনি দিকে দিকে সব মোরগ গেয়ে উঠল সেই সুরে, "আলোর ফুলকি, আলোর ফুল।"

সোনালি বললে, "দেখেছ ওদের আস্পর্ধা। তোমার সঙ্গে কিনা সুর ধরেছে, এতক্ষণ সবাই ছিলেন কোথা ?"

কুঁকড়ো বললেন, "তা হোক, সুর বেসুর সব এক হয়ে ডাক দিলে যা চাই তা পেতে বেশি দেরি হয় না, সূর্য দেখা দিলেন ব'লে।" কিন্তু তখনো কুঁকড়ো দেখলেন একটি কুটির ছায়ায় মিশিয়ে রয়েছে, তিনি হাঁক দিলেন অমনি কুটিরের চালে সোনার আলো লাগল। দূরে একটা সরষে খেত

তখনো নীল দেখাচ্ছে, কুঁকড়ো ডাক দিলেন, আলো পড়ে খেতটা সবুজ হল, খেতে যাবার রাস্তাটি পরিষ্কার সাদা দেখা গেল, নদীটা কেমন ধুঁয়াটে দেখাচ্ছিল। কুঁকড়ো ডাকলেন, অমনি নদীর জলে পরিষ্কার নীল রঙ গিয়ে মিলল। হঠাৎ সোনালিয়া বলে উঠলে, "ওই যে সূর্য উঠেছেন।" কুঁকড়ো আস্তে আস্তে বললেন, "দেখেছি, কিন্তু বনের ওপার থেকে এপারে টেনে আনতে হবে আমাকে ওই সূর্যের রথ, এসো তুমিও", বলেই কুঁকড়ো নানা ভঙ্গিতে যেন সূর্যের রথ টেনে ক্রমে পিছিয়ে চললেন, "তফাত হো তফাত হো" বলতে বলতে। সোনালিয়া বলতে লাগল, "আসছেন আসছেন", কুঁকড়ো হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, "ওপার থেকে এল রথ।" ঠিক সেই সময়ে শালবনের ওপার থেকে সূর্য উদয় হলেন সিন্দুর বরন। কুঁকড়ো মাটিতে বুক ঠেকিয়ে সূর্যের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে বললেন, "আঃ, আজকের সূর্য কত বড়ো দেখেছ!" সোনালির ইচ্ছে, কুঁকড়ো সূর্যের জয় দিয়ে একবার গান করেন। কিন্তু গলার সব সুর খালি করে তিনি আজ সকালটি এনেছেন আর তাঁর সাধ্য নাই গাইতে। যেমন এই কথা সোনালিকে কুঁকড়ো বলেছেন, অমনি দূরে দূরে সব মোরগ ডেকে উঠল "উরু-উরু-রু-রু-রু"। কুঁকড়ো শুকনো মুখে বললেন, "আমি নেই-বা জয় দিলেম, শুনছ দিকে দিকে ওরা সব তূরী বাজিয়ে তাঁর উদয় ঘোষণা করছে।" সোনালি শুধলে, "সূর্য উঠলে পর তুমি কি কোনোদিনই তাঁর জয়-জয়কার দাও না? তোমার নবতখানায় সোনার রৌশনচৌকি সূর্যের জয় দিয়ে কি কোনোদিন বাজাও নি।"

"একটি দিনও নয়" ব'লে কুঁকড়ো চুপ করলেন। সোনালি একটু ঠেস দিয়ে বললে, "সূর্য তো তা হলে ভাবতে পারেন অন্য সব মোরগেরা তাঁকে উঠিয়ে আনে।" কুঁকড়ো বললেন, "তাতেই-বা কী এল গেল।" সোনালি আরো কী বলতে যাচ্ছে, কুঁকড়ো তাকে কাছে ডেকে বললেন, "আমি তোমায় ধন্যবাদ দিচ্ছি, তুমি আমার কাছে আজ না দাঁড়ালে সকালের ছবিটা কখনোই এমন উৎরতো না।" সোনালি কুঁকড়োর কাছে এসে বললে, "তুমি যে সকালটা করতে সূর্যের রথ বনের ওধার থেকে টেনে আনতে এত কষ্ট করলে তাতে তোমার লাভটা কী হল।" কুঁকড়ো বললেন, "পাহাড়ের নীচে থেকে ঘুমের পরে জেগে ওঠার যে সাড়াগুলি আমার কাছে এসে পৌঁচচ্ছে, এইটেই আমার পরম লাভ।" সোনালি সত্যিই শুনলে, নীচে থেকে

দূর থেকে কাছ থেকে কী-সব শব্দ আসছে। সে পাহাড় থেকে মুখ ঝুঁকিয়ে চারি দিক চাইতে লাগল। কুঁকড়ো চুপটি করে চোখ বুজে বসে বললেন, "কী শুনছ সোনালিয়া, বলো।"

সোনালিয়া বলে চলল, "আকাশের গায়ে কে যেন কাঁসর পিটছে।"

কুঁকড়ো বললেন, "দেবতার আরতি বাজছে।"

সোনালি বললে, "এবার যেন শুনছি মানুষদের আরতির বাজনা টং টং।"

কুঁকড়ো বললেন, "কামারের হাতুড়ি পড়ছে।"

সোনালি, "এবার শুনছি গোরু সব হাম্বা দিয়ে ডাকছে আর মানুষে গান ছেড়েছে।"

কুঁকড়ো, "হাল গোরু নিয়ে চাষা চলেছে।"

সোনালি এবার বললে, "কাদের বাসা থেকে বাচ্ছাগুলো সব রাস্তার মাঝে চল্‌কে পড়ে কিচমিচ করে ছুটছে।"

কুঁকড়ো বলে উঠলেন, "পাঠশালার পোড়োরা চলল", ব'লে কুঁকড়ো সোজা হয়ে বসলেন। সোনালি আবার বললে, "পিঁপড়ের মতো কারা সাদা হাত-পা-ওয়ালা কাদের সব ধরে ধরে আছাড় দিচ্ছে, খুব দূরে একটা জলের ধারে পষ্ট দেখা যাচ্ছে না।"

কুঁকড়ো বললেন, "কাপড় কাচা হচ্ছে। আর দেখছি"—সোনালিয়া বললে, "এ কী, কালো কালো ফড়িংগুলো সব ইস্পাতের মতো চকচকে ডানা ঘষছে।" কুঁকড়ো দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, "ওহো, কাস্তেতে যখন্‌ শান পড়ছে তখন ধান কাটার দিন এল ব'লে।" তার পর পাহাড়তলির থেকে এদিক থেকে ওদিক থেকে চারি দিক থেকে কত কিসের সাড়া আসতে লাগল। ঘণ্টার ঢং ঢং, হাতুড়ির ঠং ঠং, কুড়ুলের খট খট, জলের ছপ ছপ, সেকরার টুকটাক, কামারের এক ঘা, হাসি বাঁশি-বাজনা সব শুনতে লাগলেন কুঁকড়ো। কাজ-কর্ম চলেছে; কেউ কি আর ঘুমিয়ে নেই বসে নেই সত্যিই দিন এসেছে, কুঁকড়ো যেন স্বপন দেখার মতো চারি দিকে চেয়ে বললেন, "সোনালি, দিন কি সত্যিই আনলেম, এই-সব কারখানা একি আমার ছিষ্টি। দিন আমি যে আনলুম মনে করেছি আমি যে ভাবছি আকাশে আলো আমিই দিচ্ছি একি সত্যি, না এ-সব পাহাড়তলি পাগলা কুঁকড়োর খ্যাপামি আর খেয়াল? সোনালি, একটি কথা বলব, কিন্তু বলো সে কথা প্রকাশ করবে না, আমার

শত্রু হাসাবে না? সোনালি, তুমি আমাকে যাই ভাব-না কেন, আমি জানি এই স্বর্গে মর্তে আলো দেবার ভার নেবার উপযুক্ত পাত্র আমি নই, এত পাখি থাকতে অতি তুচ্ছ সামান্য পাখি আমার উপর অন্ধকারকে দূর করবার ভার পড়ল? কত ছোটো, কত ছোটো আমি, আর এই জগৎজোড়া সকালের আলো সে কী আশ্চর্যরকম বড়ো, কী অপার তার বিস্তার। প্রতিদিন সকালে আলো বিলিয়ে যখন দাঁড়াই তখন মনে হয়, একেবারে ফকির হয়ে গেছি। আমি যে আবার কোনোদিন এতটুকুও আলো দিতে পারব তার আশাটুকুও থাকে না। সোনালি শুনলে যেন কুঁকড়োর কথা চোখের জলে ভিজে ভিজে, সে তাঁর খুব কাছে গিয়ে বললে, "মরি মরি।" কুঁকড়ো সোনালির মুখ চেয়ে বললেন, "আঃ সোনাল, যে আশা-নিরাশার মধ্যে আমার বুক নিয়ত দুলছে তার যে কী জ্বালা কেমন করে বলি। গান গাইতে হবে, আলোও জ্বালাতে হবে, কিন্তু কাল যখন আবার এইখানে দাঁড়িয়ে দশ আঙুলে আশার রাগিণী খুঁজে খুঁজে কেবলই মাটির বুকের তারে তারে টান দিতে থাকব, তখন হারানো সুর কি আবার ফিরে পাব, না দেখব, গান নেই গলা নেই আলো নেই তুমি নেই আমি নেই কিছু নেই? হারাই কি পাই, এরি বেদনা মোচড় দিচ্ছে বুকের শিরে শিরে সোনালি। এই যে দো-টানায় মন আমার দুলছে এর যন্ত্রণা কে বুঝবে। রাজহাঁস যখন রসাতলের দিকে গলাটি ডুবিয়ে দেয়, সে নিশ্চয় জানে, পদ্মের নাল তার জন্যে ঠিক করা রয়েছে জলের নীচে, বাজপাখি যখন মেঘের উপর থেকে আপনাকে ছুঁড়ে ফেলে মাটির দিকে তখন সেও জানে ঠিক গিয়ে সে যেটা চায় সেই শিকারের উপরেই পড়বে, আর সোনালি তুমিও জান বনের মধ্যে উই পোকা আর পিঁপড়ের বাসার সন্ধান পেতে তোমায় এতটুকুও ভাবতে হয় না, কিন্তু আমার এ কী বিষম ডাক দেওয়া কাজ। কাল যে কী হবে সেই দুঃস্বপ্নই বয়ে বেড়াচ্ছি, আজকের ডাক আজকের সাড়া কাল আবার দেবে কি না প্রাণ, গান গাব কি না ফিরে আর-একবার, তাই ভাবছি সোনালিয়া।"

সোনালি কুঁকড়োকে আপনার ডানার মধ্যে জড়িয়ে ধরে বললে, "নিশ্চয়ই কাল তুমি গান ফিরে পাবে গলা ফিরে পাবে, আলোর সুর মাটির ভালোবাসা আবার সাড়া দেবে তোমার বুকের মধ্যে।"

কুঁকড়ো সোনালিকে বললেন, "কী আশার আলোই জ্বালালে সোনালি, বলো, বলো, আরো বলো— ।"

সোনালি চুপি চুপি বললে, "আহা মরি, কী সুন্দর তুমি।" "ও কথা থাক্ সোনালি।" "কী চমৎকারই গাইলে তুমি।" কুঁকড়ো বললেন, "গান ভালো মন্দ যেমনি গাই আমি যে আনতে পেরেছি··· ।" সোনালি ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল, "ঠিক, ঠিক, আমি তোমায় যতই দেখছি ততই অবাক হচ্ছি।" "না সোনালি, আমার কথার উত্তর দাও, বলো, সত্যি কি— ।" সোনালি আস্তে বললে, "কী ?" কুঁকড়ো বললেন, "বলো, সত্যি কি আমি", সোনালি এবার তাড়াতাড়ি উত্তর দিলে, "পাহাড়তলির কুঁকড়ো তুমি সত্যি আলো দিয়ে সূর্যকে ওঠালে আজ, এ আমি স্বচক্ষে দেখেছি।"

"ভ্যালারে ওস্তাদ" বলেই তাল-চড়াইটা হঠাৎ উপস্থিত। কুঁকড়ো চমকে উঠে দেখলেন চড়াইটা তাঁর মুখের দিকে চেয়ে ভুরু তুলে শিস দিচ্ছে আর নমস্কার করছে। কুঁকড়ো ভাবছেন এ হরবোলাটা সব শুনেছে নাকি। ইতিমধ্যে সোনালিয়া আস্তে আস্তে অন্য দিকে চলেছে দেখে তিনি ডাকলেন, "আমাদের একলা ফেলে কোথায় যাও সোনালি।" চড়াই যতই হাসুক কুঁকড়োর আজ কিছুই গায়ে লাগবে না, সোনালিকে কাছে পেয়ে তাঁর আনন্দ ধরছে না।

চড়াই বললে, "বাহবা তারিফ। যা দেখলেম শুনলেম— ।"

কুঁকড়ো বললেন, "চটকরাজ, তুমি যে মাটি ফুঁড়ে উপস্থিত হলে দেখছি।"

চড়াই কুঁকড়োকে সেই পুরানো ময়লা খালি ফুলের টবটা দেখিয়ে বললে, "আমি ওইটের ভিতরে ব'সে একটা কান-কুটুরে পোকা কুট কুট করে খাচ্ছি এমন সময় আঃ, কী যে দেখলেম, কী যে শুনলেম তা কী বলি।"

কুঁকড়ো বললেন, "তার পর।" চড়াই অমনি বলে উঠলে, "তার পর যদি বলি ওই মাটির টবটা দিব্যি শুনতে পায় তবে কি তুমি অবাক হবে নাকি।"

কুঁকড়ো বললেন, "গামলা থেকে লুকিয়ে শোনা বিদ্যেও তোমার আছে দেখছি।" চড়াই জবাব দিলে, "শুধু শোনা নয় লুকিয়ে দেখার লুকি-বিদ্যেও আমি জানি, আমি এমনি অবাক হয়েছিলেম যে কখন্ যে গামলার তলার ফুটোটা দিয়ে উঁকি মেরে সব দেখেছি তা আমার

মনে নেই। আহা, কী দেখলেম রে, কী দেখলেম রে, কী সুন্দর কী সুন্দর।"

কুঁকড়ো তাকে এক ধমক দিয়ে বললে, "বটে, লুকিয়ে দেখা! তফাত যাও।" কুঁকড়ো যত বলেন, "তফাত তফাত", চড়াই ততই লেজ নাচিয়ে বেড়ায় আর ঘাড় নেড়ে কুঁকড়োর নকল ক'রে কিচ কিচ করে, "বিদ্যে ফাঁস লুকি-বিদ্যে হল ফাঁস ফুস-মন্তর হল ফাঁস ক্যাবাৎ কাব্যাৎ। কুঁকড়ো তার রকম দেখে হেসে ফেললেন। সোনালিয়া বললে, "চড়াই যখন সত্যিই তোমায় ভক্তি করে তখন ওর সাত খুন মাপ।"

চড়াই বললে, "ভক্তি করব না? এমন আলেয়া বাজিগর বুজরুগ কেউ কি দেখেছে, কী সকালের রঙটাই ফলালে কী গানটাই গাইলে গা যেন তুবড়িবাজি ভুস।"

সোনালি বললে, "এখন তোমরা দুই বন্ধুতে আলাপ-সালাপ করো, আমি চললুম।"

কুঁকড়ো বললে, "কো-ক্-কো-ক্ কোথায়?"

সোনালি বললে, "ওই যে সেই—।"

চড়াই অমনি বলে উঠল, "তাই তো, কুঁকড়োর গানের গুণে চিনে-মুরগির ছোটো হাজিরিও জমতে চলল, সাধে বলি কুঁকড়োর গান গাওয়া, চিনে-মুরগির চা খাওয়া, একসঙ্গে আসা যাওয়া।"

কুঁকড়ো সোনালিকে চুপি চুপি শুধলেন, সে একা যাবে, না তিনিও সঙ্গে যাবেন?

সোনালি বললে, না ওরকম মজলিসে তাঁর যাওয়াটা ভালো দেখায় না। কুঁকড়ো সোনালিকে বললেন, "তবে তুমি যাচ্ছ যে।"

সোনালি বললে, "আমি যাচ্ছি আজ তোমার আলোর ঝকমকানিটা কেমন তাই সেই-সব হিংসুক পাখিকে দেখিয়ে আসব", ব'লে সোনালি একবার গা ঝাড়া দিলে তার সোনার পালক-গুলো থেকে যেন আলো ঠিকরে পড়তে লাগল। সোনালি কুঁকড়োকে সেইখানে তার জন্যে থাকতে ব'লে চিনে-মুরগির মজলিসে চলল। চড়াই অমনি তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "হাঁ, কুঁকড়োর আজ সেখানে না গেলেই ভালো।"

কুঁকড়ো শোধালেন, "কেন।"

"সে তোমার শুনে কাজ নেই" ব'লে চড়াই মিটমিট করে চাইতে লাগল সোনালির দিকে।

সোনালি হেসে বললে, “না, চড়াইকেও যে তুমি পাগলা করলে” বলে সোনালী পাখি সোনালী ডানা মেলে উড়ে গেল। কুঁকড়ো চড়াইয়ের দিকে চেয়ে ভাবছেন, জিম্মা একে দেখতে পারে না, কিন্তু চড়াইটা নেহাত মন্দ নয়, একটু বক্তার বটে, কিন্তু বদমাশ তো নয়।

চড়াই এবার লেজ নেড়ে বললে, “বলিহারি তোমার বুদ্ধিকে, সব মুরগিগুলোকে বিশ্বাস করিয়েছে যে তুমিই সূর্যোদয় করে থাক, মেয়েদের চোখে ধুলো দিতে তোমার মতো ছুটি নেই, এতদিনে বুঝলেম মুরগিরা কেন তোমার অত প্রশংসা করে। হয় কলম্বস যে ডিমটি নিয়ে রাজাকে ডিমের বাজি দেখিয়েছিলেন সেই ডিমটি থেকে তুমি বেরিয়েছ, নয়তো সিন্ধবাদ যে আজগুবি সামোরগের ডিমের গল্প লিখে গেছে, তারি তুমি বাচ্ছা, এ না হলে তুমি আলোর আবিষ্কর্তা হতে না আর মুরগিদের এমন আজগুবি কথা শুনিয়েও ভোলাতে পারতে না। অণু পরমাণুদের জন্যে আলোর দোলনা, খড়ের চালে সোনার পোঁচ, এ-সব খেয়াল কি যে-সে মাথা থেকে বার হয়, না আপনাকে অতি দীন অতি হীন ব'লে চালিয়ে যেমনি দিন এল ব'লে অমনি আলোর ফুল ব'লে চেঁচিয়ে উঠে ঝোপ বুঝে কোপ মেরে যাওয়া যার-তার কর্ম।”

রাগে কুঁকড়োর দম বন্ধ হবার জোগাড় হচ্ছিল, তিনি অতি কষ্টে বললেন, “থামো, চুপ।”

চড়াই দু-পা পিছিয়ে গিয়ে বললে, “আচ্ছা, সত্যি কি তুমি জান না যে দিন-রাত যে আসে সেটা একটা প্রকৃতির নিয়ম ছাড়া আর কিছু নয়?”

কুঁকড়ো বললে, “তুমি জানতে পার আমি জানি নে। আর যাই নিয়ে ঠাট্টা কর, করো, এ কথা নিয়ে আর কোনোদিন তামাশা কোরো না যদি আমার উপর তোমার একটুও মায়া থাকে।”

চড়াই মুখে বললে, খুব মায়া খুব শ্রদ্ধা সে কুঁকড়োকে করে কিন্তু তবু খোঁচা দিয়ে ঠেস দিয়ে কথা সে বলতে ছাড়ছে না, তর্কও করতে চায়।

কুঁকড়ো রেগে বললেন, “কিন্তু যখন আমি ডাক দিতেই সূর্য উঠল আলো হল, সে আলো পাহাড়ে পাহাড়ে ছড়িয়ে গেল, আকাশে নানা রঙ ধরলে তখনো কি একবার তোমার মনে হয় না যে এ-সব কাণ্ড করলে কে।”

চড়াই বললে, "গামলায় গর্তটা এমন ছোটো যে সেখান থেকে আমি কেবল একটুখানি মাটি আর তোমার ওই হলুদবরন চরণ-দুখানি দেখেছিলেম, আকাশটা কোথায়, তা খবরেও আসে নি।"

কুঁকড়ো বললেন, "তোমার জন্য আমার দুঃখু হয়, আলোর মর্ম বুঝলে না, তুমি যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকো অত্যন্ত চালাক পাখি।"

চড়াই জবাব দিলে, "বেশ কথা, অতি বিখ্যাত কুঁকড়ো।"

কুঁকড়ো বললেন, "বেশ কথা, যে থাকবার থাক্, আমি যেমন চলেছি সূর্যের দিকে মুখ রেখে তেমনিই চলি দিনরাত এই পাখি-জন্ম সার্থক ক'রে নিয়ে। চড়াই জান, বেঁচে সুখ কেন তা জান ?"

চড়াই ভয় পেয়ে বললে, "তত্ত্বকথা এসে পড়ল শুনেই মনে হয় পিঁপড়ের পালক ওঠে মরিবার তরে", ব'লে চড়াই নিজের পালক খুঁটতে লাগল। কিন্তু কুঁকড়ো বলে চললেন, "কিছুর জন্যে যদি চেষ্টা না করব তবে বেঁচেই থাকা বৃথা, বড়ো হবার চেষ্টাই হচ্ছে জীবনের মূল কথা, তুই চড়াই সবার সব চেষ্টাকে উড়িয়ে দিতে চাস, সেইজন্যে তোকে আমি ঘৃণা করি, এই যে এতটুকু গোলাপী পোকাটি একা মস্ত ওই গাছের গুঁড়িটাকে রুপোর জাল দিয়ে গিল্টি করতে চাচ্ছে, ওকে আমি বাস্তবিকই শ্রদ্ধা করি।" "আর আমি ওকে টুপ ক'রে গালে ভরি" বলেই চড়াই পোকাটিকে ভক্ষণ করলেন। "তোর কি দয়া-মায়া নেই রে ? যাঃ, তোর মুখ দেখব না" ব'লে কুঁকড়ো চললেন। চড়াই বললে, "দয়া-মায়া নেই কিন্তু ঘটে আমার বুদ্ধি আছে, যা হোক আমি আর তোমার কিছুতে নেই তোমার শত্রুরা যা-ইচ্ছে করুক বাপু, আমার সে কথায় কাজ কী, তুমি জান আর তারা জানে।"

কুঁকড়ো শোধালেন, "শত্রু কারা শুনি ?"

"কেন, পেঁচারা।" চড়াইটা বলে উঠল।

"শেষ এও ভাগ্যে ছিল, পেঁচা হলেন শত্রু আমার, হাঃ হাঃ হাঃ" ব'লে কুঁকড়ো হেসে উঠলেন।

চড়াই বললে, "আলোর কাছে তারা এগোতে পারে না বটে, সেইজন্যে তারা এক বাজখাঁই গুণ্ডা জোগাড় করেছে, যে পাখি রোজই দিন গুনছে তাকে জবাই করতে।"

"কাকে তারা জোগাড় করেছে" কুঁকড়ো শোধালেন।

চড়াই বললে, "তোমারই জাতভাই হায়দ্রাবাদি মোরগ, আঃ, সে যে কুস্তিগীর ভীম বললেই চলে, সে তোমার আসা-পথ চেয়ে সেখানে আছে।" কুঁকড়ো শোধালেন, "কোথায়।" "ওই চিনে-মুরগির ওখানে" চড়াই বললে। কুঁকড়ো শোধালেন, "তুমি তাকে দেখতে যাচ্ছ নাকি।" "না বাবা, যে তার পায়ে লোহার কাঁটা বাঁধা কী জানি যদি লেগে যায় তবে" ব'লে চড়াইটা আড়চোখে কুঁকড়ো কী করেন দেখতে লাগল। কুঁকড়ো চট করে কুলতলার দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন। চড়াই যেন কত ভয় পেয়ে বললে, "যাচ্ছ কোথায়।" "কুলের কাঁটা যেখানে অনেক সেই কুলতলাতে যাচ্ছি" ব'লে কুঁকড়ো ঘাড় উঁচু ক'রে পায়ে পায়ে চললেন। চড়াই যেন কুঁকড়োকে কিছুতেই যেতে দেবে না এমনি ভঙ্গি করে বললে, "না তোমার যাওয়া সেখানে মোটেই উচিত হবে না, আমি বলছি যেয়ো না।" "যাওয়া চাই" ব'লে কুঁকড়ো গম্ভীর মুখে পুরোনো ফুলের খালি টবটা দেখে বললেন, "এই ছোটো গামলাটির মধ্যে তুমি সেঁধোলে কেমন ক'রে।" "কেন এমনি ক'রে" বলেই চড়াই লাফিয়ে সেটার মধ্যে গিয়ে বললে, "কেন এই এমনি করে সেঁধিয়ে এই ফুটো দিয়ে আমি দেখলুম", "কী দেখলে?" "কেন মাটি", "আর, এইবার আকাশ দেখে নাও।" ব'লেই কুঁকড়ো ডানার এক ঝাপটে টবটা উলটে চড়াইকে চাপা দিয়ে সোজা চলে গেলেন। চড়াইটা গামলার মধ্যে থেকে বেরোবার জন্যে ঝটাপটি করতে থাকল "গেছি গেছি" ব'লে।

৬

চিনি-দিদি ব্যস্ত হয়ে চারি দিকে ঘুরছেন— খাতির যত্ন ক'রে; আর তাঁর ছেলেটিও মায়ের সঙ্গে ঘুরঘুর করছেন আর মাঝে মাঝে মায়ের দু-একটা ইংরিজি উচ্চারণের আর আদব-কায়দার ভুল হলেই চমকে তাঁকে কানে কানে ধমকাচ্ছেন। ছেলেটি বিলেতে ভাসাতত্ত্ব পড়তে গিয়েছিলেন কিন্তু সাঁতার মোটেই না জানায় তিন-তিনবার প্লাকৃট হয়ে এসেছেন।

সোনালী-আঁচল উড়িয়ে বনমুরগি সোনালি যখন হেঁসেলবাড়ির খিড়কির কাছটায় পৌঁছল, তখন রাজ্যের পাখি সেখানে জুটে কিচমিচ লাগিয়েছে ; চিনি-দিদির মজলিসটা খুঁজে নিতে সোনালির আর একটুও কষ্ট পেতে হল না।

সোনালিয়াকে দেখেই চিনি-দিদি খাতির ক'রে কুলতলায় ফাঁকায় নিয়ে বসিয়ে ওদিকে চলে গেলেন। সোনালি শুনতে লাগল বোলতারা সব ফলন্ত গাছকে ঘিরে ঘিরে মোচং বাজিয়ে গাইছে, সোনা-ফলের গান, হুল রাগে।

গান

মন ভুলে গুঞ্জরি— মুঞ্জরি মুঞ্জরি।
বাতাসে গুঞ্জরি, আকাশে মুঞ্জরি।
ফুলে বউল গোছা গোছা,
ফলে মউল গাছে গাছে,
আমরা বলি গুঞ্জরিয়া—
শেষ সবারই আছে আছে।
সবজে পাতার কলি, সোনালী ফুলের মধু
বঁধু ওগো বঁধু—
ফুলের মঞ্জরি! আমরা গুঞ্জরি।
ফুল ঝরে, ফল ঝরে, কুঁড়ি ঝরে, কলি ঝরে,
মন ঝুরে গুঞ্জরি— মঞ্জরি মঞ্জরি।

শুধু যে বোলতারাই গাইছিল তা নয়; ভোমরা, মৌমাছি, গঙ্গাফড়িং সবাই দলে দলে বাছি আর গান জুড়ে দিলে। চিনি-দিদি গড়ের মাঠের বাছি যত দল, তা ছাড়া কালোয়াতি কীর্তন বাউল সব রকম জোগাড়ই করেছিলেন। কেবল চুনোগলির ব্যাণ্ডটা তিনি জোগাড় করতে পারেন নি। আর সেইজন্যে তিনি সবার কাছে বার-বার দুঃখু জানাতে লাগলেন। কালো-

কোট সাদা-কামিজে ফিটফাট কাক দরজায় দাঁড়িয়ে মোড়লি ক'রে এর-ওর-তার আলাপ-পরিচয় ক'রে বেড়াচ্ছেন— ইনি রাজহংস, ইনি হংসেশ্বরী, তুরস্কের পেরু, ও-পাড়ার চটসাঁই চড়াইমশায় ইনি আমাদের। সোনালি চড়াইকে ধুলোমাখা, কেমন হতভাগা-গোছের চেহারায় আসছে দেখে শুধলেন, "কোনো অসুখ হয় নি তো!" চড়াই সোনালিকে ফুলের টবের ইতিহাস বলতে সোনালি হেসেই অস্থির। সোনালি আর চড়ায়ে কথা হচ্ছে, এমন সময় আরো পাখি আসতে লাগল। ভিড় দেখে সোনালি চড়াইকে নিয়ে একটা জলের বোমার আড়ালে সরে দাঁড়ালেন। সেই সময় জিম্মা কাছেই একটা ভাঙা ঠেলাগাড়িতে লাফিয়ে বসল, সোনালি তাকে দেখে একবার ঘাড় হেলিয়ে নমস্কার করলেন, দূর থেকেই।

জিম্মার চেহারাটা কেমন রাগি-রাগি বোধ হল। ঘোঁটের খবর যেমন শোনা অমনি সে কুঁকড়োকে বিপদ থেকে বাঁচাতে শিকলিটা ছিঁড়ে টানতে টানতে এসে উপস্থিত ফুলতলায়। চড়াইকে বোমার পিছনে দেখে জিম্মা রাগে গোঁ-গোঁ করতে লাগল। ভয় পেয়ে চড়ায়ের লেজ কাঁপতে লেগেছে, এমন সময় ফড়িংদের স্ট্রিংব্যাণ্ড শুরু হল, সেইসঙ্গে গঙ্গা-মৃত্তিকার অলকা-তিলকা দিয়ে ছাপমারা গঙ্গাফড়িং কীর্তন ধরলেন— তুড়ি রাগিণীতে খোল বাজিয়ে সূর্যের রূপবর্ণনা।—

কনক বরন, কিয়ে দরশন
নিছনি দিয়ে যে তার।
কপালে ললিত চাঁদ শোভিত
সিন্দুর অরুণ আর
আহা কিবা সে মধুর রূপ।

দু-একজন বিলেত-ফেরত মোরগ, খোল শুনে দশা পেলেন।

তার পর মৌমাছি গাইতে লাগল দলে দলে 'মধু'র গান—

আলোতে চলি সবাই গুনগুনিয়ে,
আলোতে ফুল ফুটেছে তাই শুনিয়ে,
গুন-গুনিয়ে।

বাহিরে সোনার আলো,
ভিতরে সোনার রেণু,
বাহিরে বাজল বীণা,
ভিতরে বাজল বেণু,
সকালের আলো আলো গুন-গুনিয়ে।

ফুলের সুবাস, সোনার রেণু, পদ্মের মধু রোদ-বাতাস সব যেন একসঙ্গে এসে উপস্থিত হল। মধুকরের দল চারি দিকে সুরের মধু-বিষ্টি করে দিলে। বাহবা বাহবা পড়ে গেল। চিনি-দিদি কিন্তু গানও বুঝছেন না, সুরও শুনছেন না। তিনি কেবল কারা কারা তাঁর পার্টিতে এসেছে তারি হিসেব সবাইকে দিচ্ছেন, "বোঝা থেকে শাকের আঁটিটি পর্যন্ত কেউ আর আসতে বাকি নেই, দেখেছ ভাই?" একটা শ্যামা পাখি পেয়ারা গাছে বসে শিস্ দিলে, অমনি চিনি-দিদি বললেন, "ওই শ্যামদাসী এলেন। ওই বুঝি কাছিমুদ্দি? না না কাছিম বুড়ো তো নয়। এ তবে কে। সবাইকে তো চিনি নে ভাই, তেনার সব পুরোনো বন্ধু।" একটা ভীমরুল বোঁ-বোঁ করে চারি দিকে ঘুরে বেড়াতে লাগল, চিনি-দিদি তার পিছনে "ভালো আছ? ভালো আছ?" বলতে বলতে ছুটলেন।

চড়াই সোনালিকে বললে, "চিনি-দিদি একেবারে খেপে গেছেন।" সোনালি মজা দেখবার জন্যে আড়াল থেকে বেরিয়ে দাঁড়ালেন। চিনি-দিদি ভীমরুলের সঙ্গে খানিক ছুটে একটা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে একটু কপি পাতা খাচ্ছেন এমন সময় হাওয়াতে টুপ টাপ ক'রে পাতার শিশিরের সঙ্গে একটি শিউলি ফুল ঝরে পড়ল। চিনি-দিদি অমনি বলে উঠলেন, "অ শিউলি, অ শিশির, এতক্ষণে বুঝি আসতে হয়?" এই সময় একটু হাওয়া উঠল আর টুপ করে একটি কুল চিনি-দিদির ঠিক নাকের উপরে পড়ে গেল, চিনি-দিদি চমকে উঠে বললেন, "এই যে বাতাসি-দিদিও এসেছ। তবু ভালো যে মনে পড়েছে।" বলে কতকগুলো গিনিপিগ নিয়ে চিনি-দিদি খাওয়াতে চললেন। "কে যে চিনি-দিদির চেনা নয়, তা জানি নে।" ব'লে চড়াই এদিক-ওদিক ভালো করে দেখে পা টিপে টিপে বেরাল যেখানে আতা গাছের ডালে গুঁড়ি মেরে বসে এদিক-ওদিক দেখছিল, সেইখানে গিয়ে বললে, "সব ঠিক তো বন্দোবস্ত?" বেরাল

একবার ওই ওদিকটায় ঘাড় তুলে দেখে বললে, "সব ঠিক। আসছে তারা।" এদিকে চিনি-দিদি সোনালিকে নতুন বিলিতি কলে-দিয়ে-ফোটানো ছুটি মুরগির ছানার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে, এমন সময় দূরে ময়ূর গলা-খাঁকানি দিলেন, "কেও, চিনি নাকি।" ময়ূর এসে বুক ফুলিয়ে দাঁড়ালেন ; মুরগি, হাঁস, তিতির, বটের সব অমনি তাঁকে ঘিরে যেন রথ দেখবার ভিড় করলে। ময়ূর সবাইকে জাঁকালো পোশাক আর হীরে জহরতের ভাউ বাৎলাতে লাগলেন, খুব বুদ্ধিমানের মতো গম্ভীর মুখ ক'রে। জিম্মা কুত্তানি কিন্তু ময়ূরকে দেখে মনে-মনে বললে, 'এটার মতো দেমাকে অদ্ভুত জানোয়ার আর ছুটি দেখা যায় না।' এমন সময় কাক দরজা থেকে ফোকরালেন, "চাটগাঁই মোরগ।" চিনি-দিদি এ-নাম কখনো শোনেন নি ; বুঝি-বা ভুল করেছে কাকটা ভেবে সেদিকে যাবেন, এমন সময় সত্যিই সাদা জোব্বা-খাব্বা, কালো চাপদাড়ি মোড়াসা-মাথায় চাটগাঁই এসে সেলাম করলেন। চিনি-দিদির মুখে আর কথা সরল না। তার পর কাক একে একে সব অদ্ভুত মোরগের নাম ফোকরাতে থাকল, "সিংগালি, বোগদাদি, জাপানি।" সবাই বলে উঠল, "একি ব্যাপার।" চিনি-দিদি বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখলেন দলে দলে অদ্ভুত মোরগ সব আরো আসছে, "সেলেম সাহি, খাঁ খানানি, তখ্‌তে তাউস, কান্দাহারি, কাবুলী, জবরদস্ত ঝোঁটনদার, চম্পাধাড়ি, কুলঝুটি, খুঞ্চেপোষ, ডেগচি, মোগলাই, জবড়জঙ্গ, ইয়াহুদি, চাল বাহাদুর, খেতাববক্স, মেজাজি, পরহুস্বা, মুলুকচাঁদি, বাজখাঁই, শির-ই-ফরহাদ, গোলগুম্বজ, কাবাবি।"

চিনি-দিদি দেখে শুনে অবাক, কেবল লেজ দোলাচ্ছেন আর বলছেন, "ওমা কোথায় যাব। ওলো দেখ, কী হবে গো, এমন তো কখনো দেখি নি।"

নবাবী আমলের মোরগ সব একে একে এলেন। এবার পাটনাই মোরগ সব আসছেন, "তিলকধারী ভোজপুরি, রামদুলালি।"

"ওমা কোথায় যাব।" বলে চিনি-দিদি সবাইকে খাতির করতে ছুটলেন।

এবার গৌড়িয়া মোরগ সব আসছেন, "গোবরগণেশ, চালপিটুলি, মোহনভোগ, বামুনমারি, কানাইচুড়ো, চৌগোপলা, ঢেঁকুচকুচ, ঢাক-পিটুনে, ফিকুরে গোঁসাই, বেঁটেবক্কট, কয়লাধামা, রাজকুমড়ো, থুত্তি নাত্তি।"

কুলতলাটা ঝুঁটিতে, পালকে, চাপদাড়ি, গোঁপ, টিকি আর পোষা-পালা বড়ো বড়ো খেতাব-জাইগীর-শিরপেঁচওয়ালা মোরগের ভিড়ে সরগরম হয়ে উঠল, যেন পালকের গদী। কারু লেজের পালক, মেপে সাতগজ। কারু গলায় যেন উলের গলাবন্ধ জড়ানো রয়েছে। একজনের ঝুঁটির কেতা যেন রামছাগলের শিং। কারু মাথায় জরির তাজ, কারু এক চোখে চশমা, অন্য চোখটা টুপিতে ঢাকা; কারু বুকে ফুলের তোড়ার মতো খানিক পালক, কারু আঙুল দস্তানায় মোড়া, কারু-বা আঙুল এত লম্বা যে কিছুই ধরতে পারে না। কেউ ঝাঁকড়া চুলের উপরে আবার টিকি রেখেছে, আর কারু-বা মাথায় চুলও নেই, টিকিও নেই, কিছুই নেই। ঘাড়ে-গর্দানে-সমান এই শেষের মোরগটা হচ্ছে সেই নামজাদা লড়ায়ে মোরগ, যে বিলেত পর্যন্ত মেরে এসেছে। এরি দুপায়ে ইস্পাতের কাঁটা-মারা ভয়ংকর দুটো কাতান মানুষ শখ করে বেঁধে দিয়েছে, অন্য মোরগকে লড়ায়ে খুন ক'রে বাজি জেতবার আর মজা দেখবার জন্যে। ঘোড়দৌড়ের খেলায় যেমন, তেমনি এই মোরগের লড়াই দেখতে আর বাজি লাগাতে লোকে টিকিট পায় না, এত ভিড় হয়।

বেরাল চড়াইকে গাছের উপর থেকে এই মোরগটাকে দেখিয়ে বললে, "এই সেই বাজখাঁই গুণ্ডা বা লড়ায়ে মোরগ বা নবাব বাজেখাঁর বাবুর্জিখানার শেষ-পোষা পাখি। পুরুষানুক্রমে এদের ঘাড় এমন শক্ত যে মোটেই নোয় না, ইনি খালি দিল্লীর লাড্ডু খেয়ে লড়েন।"

এইবার সব বিলেত-ফেরতা মোরগ এলেন, "মিস্টার চচ্চড়ি, মিঃ ভাজি, মিঃ ঘণ্ট, মিঃ আবার খাব, মিঃ চাপাটি, মিঃ বে-হোঁস।" চিনি-দিদি ভাবছেন এই-সব মোরগের মুরগিদের নিয়ে আসছে-বারে তিনি একটা পর্দাপার্টি দেবেন। দাঁড়কাক তখনো হাঁপাতে হাঁপাতে ফুকরোচ্ছে, "রামধনুস, রঙবেরঙ, বুঁদেলা মল্, রণছোড় ভাগি, ধান ভগৎজিউ···" যত মাড়োয়ার দেশের মোরগ, সিন্দি কচ্ছি, অরোদা-বরোদা সবাই এলে পর দাঁড়কাক মুখ ফিরিয়ে দেখলে— কুঁকড়ো। সে তাঁর পদবী উপাধি ফুকরোতে যাবে, কুঁকড়ো বললেন, "কিছু দরকার নেই। শুধু জানিয়ে দাও আমি কুঁকড়ো এলেম।" দাঁড়কাক তাঁর আপাদমস্তক দেখে নিয়ে মুখটা বেঁকিয়ে জোরে হাঁক দিলে, "কুঁকড়ো-ও-ও।" কুঁকড়ো অতি শান্ত ভালোমানুষটির মতো চিনি-দিদিকে নমস্কার করে বললেন, "আমাকে মাপ করতে হবে, আমার সাজসজ্জা পদবী উপাধি কিছুই নেই, আমার ঠিক যতগুলো আঙুল হওয়া উচিত তাই আছে, আর মাথার এই লাল একটিমাত্র টুপি, জন্মাবধি

এইটেই প'রে বেড়াচ্ছি, সে কথাটা লুকিয়ে লাভ নেই। আর আমার এই গায়ের কাপড়— এটা প'রে এখানে আসাটা বাস্তবিক অন্যায় হয়েছে; দেখো-না রঙচঙ বেশি নেই, কেবল একটু কচিপাতার সবুজ আর পাকা ধানের সোনালী। মাফ করো, আমি নেহাতই একটা সাধারণ কুঁকড়ো যাকে দেখা যায় ধানের গোলায়, চালের মটকায়, গির্জার চুড়োয়, সোনায় মোড়া ছেলেদের হাতে টিনের বাঁশির আগায় রঙ-করা, জলেস্থলে সর্বত্র। কেবল কোনো চিড়িয়াখানায় আর জাদুঘরে আমার দেখা পাওয়া যাবে না।"

চিনি-দিদি বললেন, "তা হোক। তোমার কাজের সাজে এসেছ তাতে কী দোষ। তোমার সময় কোথা যে, সেজে বেড়াবে? কাজের পাখি তোমার সব দোষ মাপ। কিন্তু যারা বিয়েতে যায়, কেরানীর কিম্বা উকিল ব্যারিস্টার মোক্তারের সাজ প'রে, কিম্বা বুট হ্যাট প'রে যায় বউ-ভাতের ভোজে, তাদের আমি কিছুতে মাপ করি নে।"

দাঁড়কাক ফোকরাল, "জুড়ি লোটন পায়রা।" কুঁকড়ো ভাবলেন বুঝি তাঁর বন্ধু কবুদ আর কবুদনী। কিন্তু ফিরে দেখলেন সাদা দুটি গুজরাটি, পায়রা কি— কী, বোঝবার জো নেই, ডিগবাজি খেতে খেতে ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ল। তার পর দাঁড়কাক ফুকরলে, "ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদর রাজহংস স্বামিজী।" কুঁকড়ো পদ্মবনের মরাল আসছেন ভেবে আনন্দে দরজার দিকে চেয়ে রইলেন, অনেকক্ষণ পরে পাখির মতো পাখি আসছে ভেবে; কিন্তু হেলতে দুলতে সাদা মরাল না এসে, নেংচাতে নেংচাতে এলেন এক পাখি, দেখতে মরালের মতো কতকটা, কিন্তু মোটেই সাদা নয়, সিধেও নয়, কালো ঝুল। কুঁকড়ো নিশ্বেস ছেড়ে বললেন, "মরাল না এসে এল কিনা মরালের একটা বিকট কালো ছায়া।" ব'লে কুঁকড়ো একটা দোলার উপরে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক দেখতে লাগলেন, দূরে সবুজ মাঠ, তারি উপরে ধেনু চরছে, বাছুরগুলো ছুটোছুটি করছে; কোথায় আমলকী গাছের ছায়ায় বাঁশি বাজছে তারি শব্দ। পৃথিবীর সবই এখনো এই-সব হরেক রকম পোষা পাখিগুলোর মতো টেরে বেঁকে অদ্ভুত রকম হয়ে ওঠে নি; সাদাসিদে গোলগাল যেমন ছিল তেমনিটি আছে। ঘাসের রঙ সবুজই রয়েছে, আকাশ নীল, জল পরিষ্কার, পাখিরা উড়ছে ডানা ছড়িয়ে, গোরু হাঁটছে চার পায়ে, মানুষ চলেছে দুপায়ে। কুঁকড়ো আনন্দে এই-সব দেখছেন আর সোনালি আস্তে আস্তে তাঁর কাছে এসে দাঁড়িয়ে বলছে, "এই-সব

চিড়িয়াখানার উপযুক্ত অদ্ভুত সঙগুলোকে আমার ভারি খারাপ লাগছে, আর একদণ্ড এখানে থাকা নয়, চলো আমরা দুজনে সেই বনে চলে যাই ; সেখানে আলো আর ফুল আর তোমার আমার ভালোবাসা।” কুঁকড়ো ঘাড় নেড়ে বললেন, “না সোনালি, সে হতে পারে না। বিধাতা যেখানে রেখেছেন সেইখেনেই আমাকে থাকতে হবে। আমি জানি এই আবাদটুকুর মধ্যে করবার মতো কাজ আমাদের অনেক রয়েছে, আর, সবার ভালোবাসাও এখানে পাচ্ছি তো।”

সোনালির মনে পড়ল রাত্রের ঘুঁটের কথা ; কিন্তু ওদের ভালোবাসা যে মোসলমানের মুরগি-পোষার মতো, সেটা ব'লে কুঁকড়োকে দুঃখ দেওয়া কেন। সে বার বার বলতে লাগল, “না না, চলো দুজনে চলে যাই, আহা সেই বনে যেখানে বসন্ত-বাউরী কেবলি বলছে, ‘বউ কথা কও’ ; আর পাতায় পাতায় সোনার অক্ষরে ভালোবাসার গান সব লেখা হচ্ছে সকাল থেকে সন্ধে।”

এই সময় ওধারটায় কিচিরমিচির শব্দ উঠল, সব পাখিরা ময়ূরকে পাখম ছড়াবার জন্যে পেড়াপিড়ি করছে। চিড়িয়াখানার সব মোরগগুলো তাদের সম্পর্কে পাখমদাদা ময়ূরের চারি দিকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। অনেক বলা-কওয়াতে ময়ূর পাখম খুলে দেখালেন। পাতিহাঁস হাঁ করে চেয়ে রইল। ময়ূরের কাছে কোটের কাটকুট নমুনো ফ্যাশান চাইতে লেগে মোরগদের মধ্যে হট্টগোল বেধে গেল। সবাই ময়ূরকে আপনার আপনার সাজগোজ দেখিয়ে পাস হতে চাচ্ছে, এক মোরগ অন্যকে ঠেস দিয়ে বলছে, “তোমায় দেখতে হয়েছে ওই কাপড়ে, যেন সুড়ঙ্গে সুপুরি গাছটি।” সে আবার তাকে এক ধাক্কা দিয়ে বলছে, “আর তোমারই সাজাটা কী দেখতে হয়েছে? যেন মগের মুল্লুকের আটচালাখানি, শিং বের-করা ছুঁচোলো।” সবাই যখন সাজসজ্জা দেখাতে মারামারি বাধিয়েছে তখন কুঁকড়ো গলা চাড়িয়ে বলে উঠল, “তাকাও, তাকাও, ওদিকে তাকাও।” কুঁকড়োর কথামত সব মোরগ মায় ময়ূর হাঁস আর যত দেমাকে পোশাকী পাখি সবাই সেই কাপড়-ঝোলানো খড়ের কুশো-পুতুলটার দিকে চেয়ে দেখলে, হাওয়াতে সেই খড়ের কাঠামোর কামিজের হাতাটা লটপট ক'রে যেন তাদেরই দেখিয়ে কী বলতে যাচ্ছে। ভয়ে সব পোশাকী পুষ্যি পাখিদের মুখ চুন হয়ে গেল। কুঁকড়ো হেঁকে বললেন, “তাকাও, তাকাও, উনি তোমাদের আশীর্বাদ করছেন।” মোরগগুলো কুঁকড়োর দিকেই চেয়ে রইল, তখন কুঁকড়ো বললেন, “ওই

যে কাঠামোটার পায়ে পেণ্ট্‌লুন লটপট করছে, ওটা কী বলছে জানো? আমার এই ছক-কাটা ছিট একদিন ফ্যাশান ছিল, উনোপঞ্চাশ টাকা গজ দরে আমি বিকিয়েছি, এক কালে। আর ওই যে ভাঙা তোবড়ানো সোলার টুপি ওটার মাথায় চড়ানো দেখছ, ওটাই-বা কী বলছে?— আমিও একদিন ফ্যাশান ছিলুম, আশি টাকা দিয়ে লোকে আমায় কিনেছিল, এখন মেথরও আমাকে মাথায় দিতে লজ্জা পায়। আর ওই দেখো কোট, তার এখনো ভুল ভাঙে নি, সে এখনো দেখো, চলতি বাতাসে উড়ে উড়ে আকাশে ফ্যাশান হাতড়ে বেড়াচ্ছে। চলতি বাতাস চলে গেল আর ওই দেখো ফ্যাশান-ধরা নিষ্কর্মা কোটের হাতদুটো নিরাশ হয়ে ঝুলে পড়ল।" এই কথা কুঁকড়ো যেমন বলেছেন আর সত্যি সত্যি বাতাস বন্ধ হল, সব পাখিরা দেখলে ছুই হাতা মাটির দিকে ঝুলিয়ে কুশো-পুতুলটা স্থির হয়ে দাঁড়াল। তারা সব সেইদিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে এমন সময় ময়ুর বললে, "রাখো, ওটা কি কথা বলতে পারে যে এ-সব বলবে। তুমিও যেমন।"

কুঁকড়ো ময়ুরকে বললেন, "তুমি যা বললে ওটাকে, মানুষেরা ঠিক ওই কথাই তোমাকে বলছে ইস্ত-না-গা-দ।"

ময়ুর তার কাছের এক পাখিকে চুপি চুপি বললে যে, এই-সব জাঁকালো জাঁদরেল পোষা মোরগকে সোনালির সামনে হাজির করাতেই কুঁকড়োটা তার উপর খাপ্পা হয়েছে। তার পর ময়ুর কুঁকড়োকে বললে, "আচ্ছা, এই যে সব জাঁদরেল মোরগ এসেছেন, এঁদের তুমি ঠাউরেছ কী শুনি?"

বুক ফুলিয়ে কুঁকড়ো উত্তর দিলেন, "দর্জির হাতে সেলাই করা, কলে কাটা, কাঁচি দিয়ে ছাঁটা নকল ছাড়া এরা আর কিছুই নয়। সবটাই এদের জোড়াতাড়া দেখছি, ওর ডানা তার ঝুঁটি, এমনি সব টুকিটাকি দিয়ে গড়া এদের চেহারাগুলো কাঁসারিপাড়ার সঙের বিজ্ঞাপনে লাগতে পারে; আর-কোথাও এমন-কি, এই সামান্য গোলাবাড়িতেও, এদের দরকার মোটেই নেই। এদের চলন, বলন, গড়ন সবই বেসুরো, বেয়াড়া, বেখাপ্পা। ডিমের সুন্দর ডৌলটি নিয়ে সব পাখিই বেরিয়ে আসে জগতে, কিন্তু ডিম ফাটিয়ে এরা যে বেরিয়েছে তার কোনো লক্ষণ তো এদের শরীরে দেখছি নে।"

কুঁকড়োর কথা শুনে একটা পোশাকী মোরগ রেগে বলে উঠল, "বাড়াবাড়ি কোরো না।" কুঁকড়ো সে কথায় কান না দিয়ে বলে চললেন, সূর্যের দিকে চেয়ে, "এরা কি সত্যিকার মোরগ। কখনোই নয়। কোথায় এদের মধ্যে সেই সকালের আলো, সেই রক্তের মতো রাঙা সুর। সূর্য তুমি সাক্ষী, এরা দেখতে হরেক রকমের বটে, কিন্তু মিথ্যে ছায়া-বাজি বৈ সত্যি নয় সত্যি নয়। আর ছায়াবাজিরই মতো এরা তামাশা দেখিয়ে কোথায় মেলাবে তার ঠিক নেই। এদের কেউ বেঁচে থাকবে না, হ-রে-ক-র-ক-ম-বা-জি-বা-হ-বা" ব'লে কুঁকড়ো একটু থামলেন। ময়ূর শোধালে, "কাকে তুমি সত্যিকার মোরগ বল শুনি।"

"সত্যিকার মোরগ তাকেই বলি যার একমাত্র ধ্যান হল", ব'লে কুঁকড়ো চুপ করলেন। সব পাখিই অমনি শুধোলে, "কী কী? ধ্যান হল কী?"

কুঁকড়ো বুক-ফুলিয়ে বললেন, "আলোর ফুলকি— ই-ই—।"

সব পোশাকী মোরগ অমনি বাজখাঁই গলায় বলে উঠল, "কা-লো-কু-ল-চু-র। হাঁ, হাঁ এই তো চোখ বুজলেই আমরা সরষে-ফুলের মতো গুঁড়ো গুঁড়ো কী যেন দেখতে পাচ্ছি। বাঃ এ তো সবাই ধ্যান করে, নতুনটা কী হল?" ব'লে মোরগগুলো কুঁকড়োকে প্রশ্ন করতে লাগল, তিনি ওড়বে না খাড়বে না নাদে গলা সাধেন? তিনি দক্ষিণী চালে গান করেন না হনুমানের মতে। কোন্ রাগে তার দখল বেশি।

কুঁকড়ো সংগীতশাস্ত্র, স্বরলিপি এ-সবের ধার দিয়েও যান নি; তিনি প্রশ্ন শুনে অবাক হলেন। কুঁকড়ো গাইবে কুঁকড়োর মতো, হনুমানের মতে কেন যে হনুমান ছাড়া আর কেউ গাইতে যাবে কুঁকড়ো তা বুঝে উঠতে পারলেন না। এক মোরগ বললে, "রোসো, তালটা ঠিক করে নেওয়া যাক, 'কা-আ-আ-লো-ও-ও-ও'···নাঃ মিলল না তো, ফাঁকের বেলায়ও সোম পড়ছে, সোমের বেলাতেও তাই, ফাঁক মোটেই নেই।" ফাঁকা আওয়াজের জন্যে কেন যে এ পাখিটা এত ব্যস্ত তা কুঁকড়ো বুঝলেন না। এক মোরগ মুখে মুখে স্বরলিপি করে যাচ্ছিল, সে বললে, "প্রথম লাগল মধ্যম আ-মা; তার পর লো, রি-র-গা-র-গা এই হল মা-রি-গা।"

আর-একজন বললে, "মা-রি-গা তো নয়, ধ-পা-স।"

কুঁকড়োর মনে হল, ঠিক সবাই পাগল হয়ে গেছে। এ-সব কী খেয়াল। তিনি সাফ জবাব দিলেন, তিনি কোনো গানের ইস্কুলে গান শেখেন নি, শাস্তর-মাস্তর তিনি জানেনও না মানেনও না, গোলাপ যেমন ফুল ফুটিয়ে চলেছে, তিনি তেমনি গান গেয়ে চলেছেন, এইটুকুই তিনি জানেন।

কুঁকড়ো শাস্ত্রের কিছুই জানেন না দেখে অন্য মোরগগুলো তর্ক ছাড়লে। কিন্তু গোলাপের শোভা কি কুঁড়িতে কি ফোটা অবস্থায় ময়ুরটার অসহ্য ছিল, দেখলেই সে ঠোকর দিতে ছাড়ত না; কুঁকড়ো গোলাপের নাম করতেই ময়ুরটা অমনি বলে উঠল, "গোলাপ আবার একটা ফুলের মধ্যে নাকি?"

কুঁকড়ো গোলাপের নিন্দে শুনে রেগেই লাল; তিনি সব মোরগকে শুনিয়ে বললেন, "কুঁকড়ো কিম্বা মোরগ হয়ে গোলাপের নিন্দে যে সয় সে নরাধম কুলাঙ্গার···।"

"হেঃ তে-রি-গো-লা-প!" ব'লে বাজখাঁই মোরগ তাল-ঠুকে উপস্থিত, "আওতো, কুঁকড়ো দেখে" ব'লে।

"আও।" ব'লেই কুঁকড়ো বুক-ফুলিয়ে এগিয়ে এসে বললেন, "তোকেই খুঁজছিলেম ঝুঁটিকাটা কাকাতুয়া।"

বাজখাঁই কেওমেঁও করে বলে উঠল, "ক্যা বোলা? এ কেসা বাত হুয়া?— কা-কা-তু-য়া-তুয়া কাকা।"

কুঁকড়ো ঠিক তেমনি সুরে বলে উঠলেন, "ক্যা বোলা কা-কা-তুয়া।"

খানিক দুজনে চোখ পাকিয়ে পালক ফুলিয়ে এ-ওর দিকে চাওয়াচায়ি হল। তার পর বাজখাঁই বললে, "তুমসে কুস্তিগীর পাহালোয়ান জাহানদার জবরদস্ত দশ জোয়ানকো সাথ বেলায়েৎমে ময় লড়া হুঁ, আউর জিতা হুঁ, দো দশকো ঘয়েল ভি কিয়া।"

কুঁকড়োর কাজ খুন নয়— ভয় যারা পায় তাদের অভয় আর আলো দেওয়া। তিনি কিন্তু তাই ব'লে কাপুরুষ ভীরু ছিলেন না, এগিয়ে এসে বললেন, "তবে লড়ায়ের আগে একবার আলাপ-পরিচয়টা হয়ে যাক।"

বাজখাঁই চেঁচিয়ে বললে, "মেরা নাম ফতে-জঙ্গ তাগবাহাদুর মালিকিময়দান।"

কুঁকড়ো হেসে বললেন, "আর আমার নাম কুঁকড়ো।"

লড়াই বাধে দেখে সোনালি ভয় পেয়ে জিম্মার কাছে ছুটে গেল। কুঁকড়ো বললেন, "জিম্মা, খবরদার, তুমি এতে কোনো কথা বলতে পাবে না, তুমি নড়তে পাবে না, যেখানে আছ সেখান থেকেই শেষ পর্যন্ত দেখো।"

সোনালি বললে, "একটা গোলাপ ফুলের জন্যে প্রাণ দিতে যাবে?"

কুঁকড়ো গম্ভীর সুরে বললেন, "ফুলের অপমানে সূর্যের অপমান, তা জান?"

সোনালি চড়াইয়ের কাছে ছুটে গিয়ে বললে, "তুমি যে বলেছিলে সব মিটিয়ে নেবে?"

চড়াই গম্ভীর হয়ে উত্তর করলে, "সব মেটে কিন্তু জ্ঞাতির ঝগড়া মেটে না গো মেটে না।"

চিনি-দিদি বুক চাপড়াতে লেগেছেন আর বলছেন, "এ কী গো। লোকের বাড়ি নেমন্তন্নে এসে খুনোখুনি।" এই বলছেন আর কুঁকড়োর লড়াই দেখবার জন্যে সবাইকে বসাচ্ছেন—ফুলের টবে, লাউকুমড়োর মাচায়। দেখতে দেখতে সব পাখি দুই পালোয়ানকে ঘিরে বসে গেল কুস্তি দেখতে। সবপ্রথমে মুরগিরা গোল হয়ে বসেছে, ছানাপোনা কোলে, তার পর হাঁস ইত্যাদি, শেষে যত পোশাকী মোরগ, ময়ূর এঁরা।

জিম্মা কুঁকড়োকে ডেকে বললে, "জেতা চাই, পাহাড়তলির নাম রেখো।"

কুঁকড়ো একবার চারি দিক চেয়ে দেখলেন, সবাই আজ তাঁকে যেন মরতে দেখতে ঘাড়গুলো বাড়িয়ে বসে আছে মনে হল। কোথাও একটু ভালোবাসা নেই— হিংসে আর খুনের নেশায় সবার মুখ বিকট দেখাচ্ছে। কুঁকড়ো একটি নিশ্বেস ফেললেন।

সোনালি চোখের জল মুছে বললে, "আহা, কাচ্ছাবাচ্ছাগুলির কী হবে গো।"

কিন্তু কুঁকড়োর প্রাণে কোনো দুঃখু নেই, তিনি বুঝলেন যে, তাঁকে মরতেই হবে। তবে মরবার পূর্বে কেন না তিনি সবার কাছে প্রচার করবেন, যা এতদিন কাউকে বলা হয় নি। এই তো ঠিক সময়। তবে আর কেন গোপন রাখা তাঁর মহামন্ত্র। কুঁকড়ো সবাইকে বললেন, "শোনো তোমরা আমার গোপন কথা, মহামন্ত্র, যা এতদিন বলি নি, আজ ব'লে যাব।"

সবাই যেটা জানতে ব্যস্ত, সেটা আজ কুঁকড়ো প্রচার করবেন, মুরগিদের আনন্দ আর ধরে না। কুঁকড়ো বাঁচুক মরুক তাতে কী। মন্তরটা শুনতে পেলেই হল। তারা সবার আগেই

গলা বাড়িয়ে বসল। কুঁকড়ো সেটা দেখলেন। হায়দ্রাবাদিটা কেবল তাল ঠুকছিল, তার আর তর সয় না। কুঁকড়ো তাকে বললেন, "ভয় নেই, পালাব না, একটু সবুর করো।" তার পর সবার দিকে চেয়ে বললেন, "কথাটা শুনে তোমাদের যদি খুব হাসি পায় তো খুবই হেসো; তামাশা টিটকিরি দিতে চাও তাও দিয়ো, আমি তাই দেখেই সুখে মরব।" সোনালি চেঁচিয়ে বললে, "ছিঃ, ও কী কথা।" জিম্মা বুঝেছিল, কুঁকড়োর মনের কথাটা কী; তাই সে বললে, "বেনা বনে মুক্ত ছড়িয়ে কী লাভ হবে বন্ধু।" কিন্তু কুঁকড়ো যখন বলেছেন তখন তিনি আর সে কথা নড়চড় হতে দেবেন না। তাঁর মুখ দেখে জিম্মা আর সোনালি দুজনেই চুপ হয়ে গেল। কুঁকড়ো চারি দিকে দেখে বললেন, "নিশাচরদের বন্ধু, অন্ধকারের পাখি সব। তবে শোনো, আর শুনে আমায় পাগল ব'লে খুব হাসো। আজ আমার কাছে তোমাদের কিছুই লুকোনো রইল না, কে আমার আপনার, কেবা পর সব চেনা গেল, ধরা পড়ল। তবে আজ আমিই-বা লুকিয়ে থাকি কেন আপনাকে না জানিয়ে।" ব'লে কুঁকড়ো আর-একবার চারি দিক দেখে বললেন, "আলোর ফুলকি, আলোর ফুল আকাশে ফোটে কেন তা জানো? আমি গান গাই ব'লে।" প্রথমটা সবাই থ হয়ে গেল, তার পর একেবারে হাসির হুল্লোড় উঠল, "পাগল! পাগল।"

কুঁকড়ো বলে উঠলেন, "সবাই হাসছ তো।" ব'লেই হাঁক দিলেন, "সামাল জোয়ান সামাল।"

লড়াই শুরু হয়ে গেল। তখনো সবাই হাসছে, কী মজা, উনি গান গেয়ে আকাশে আলো জ্বালান, কী আপদ···।

কুঁকড়ো বাজখাঁই মোরগের এক প্যাঁচ সামলে বললেন, "হাঁ আমিই সূর্যের রথ রোজকে রোজ টেনে আনি।" তার পরেই কুঁকড়োকে বাজখাঁই এক ঘা বসালে; তার পর আর-এক ঘা, আর-এক ঘা। সবাই চারি দিক থেকে চীৎকার করতে লাগল, "বাহবা বাজখাঁ, চালাও, জোরসে ভাই।" কুঁকড়োর মুখে চোখে ঘা পড়ছে আর সবাই চেঁচাচ্ছে, "খুব হুয়া, বহুত আচ্ছা, জেসাকে তেসা, ইয়েঃ মারা।" ওদিকে কুঁকড়োও ব'লে চলেছেন, "আমিই আলো আনি, সকাল আনি, আলো, আলো, আলো।" কুকুর চেঁচাচ্ছে, "হাঁ হাঁ।" সোনালি কাঁদছে চোখ ঢেকে, আর সব পাখি তারা ব'লে চলেছে হাততালি দিয়ে, "চালাও বাজখাঁই চোঁচ,

আওর এক লাথ তুণ্ডমে, বাহবা বাজখাঁ, খুব লড়তা, ইয়েঃ এক ঘা, উয়োঃ দো ঘাও, মারা মারা।" রাজ্যের পাখির গালাগালি হাসি টিটকিরির মধ্যে কুঁকড়ো এক-এক পা করে ক্রমে মরবার দিকে এগিয়ে চলেছেন। তাঁর বুক বেয়ে রক্ত পড়ছে, গায়ের পালক সব ছিঁড়েখুঁড়ে চারি দিকে উড়ছে, চোখ ঝাপসা হয়ে এসেছে, মনে হচ্ছে পৃথিবী যেন ঘুরছে কিন্তু তবু তিনি যুঝছেন। কিন্তু শক্তি ক্রমেই কমছে। এই সময় তাঁর মোরগ-ফুলের উপরে বাজখাঁ এমন এক ঘা বসিয়ে দিলে যে কুঁকড়ো অসান হয়ে বসে পড়লেন। অমনি চারি দিকে সবাই চেঁচিয়ে উঠল, "বাহবা কী বাহবা। ঘায়েল হুয়া, ঘায়েল হুয়া।"

জিম্মা রাগে ফুলতে লাগল আর তার দুই চোখ দিয়ে দরদর করে জল পড়তে লাগল। কুঁকড়োর হুকুম, তার নড়বার জো নেই। কিন্তু সে তার বন্ধুর দুর্দশা আর দেখতে পারে না। সে ধমকে উঠল, "তোরা সব পাখি না মানুষ?" জিম্মা বলতে চায় যে মানুষ ছাড়া এমন নির্দয় আর কে হতে পারে। কিন্তু তার কথা জোগাল না; সে কেবল বলতে লাগলে, "ওরে, এরা পাখি, না মানুষ?" কুঁকড়ো যখন সান পেয়ে আবার চোখ মেললেন, তখন সব চুপচাপ রয়েছে, হায়দারি মোরগ বেড়ায় ঠেস দিয়ে হাঁপাচ্ছে, জিম্মা কেবল কাছে দাঁড়িয়ে; আর দূরে, সব পাখির দলের থেকে দূরে, ডানায় মুখ ঢেকে রয়েছে সোনালিয়া।

কুঁকড়ো জিম্মাকে বলছেন, "এই শেষ, না যন্ত্রণার আরো কিছু রেখেছে পোশাকী পাখি আর তাদের দলবলেরা।" এমন সময় দেখা গেল, সব পাখি পা টিপে টিপে কুঁকড়ো যেখানে পড়ে রয়েছে সেই দিকে দল বেঁধে এগিয়ে আসছে; সবার মুখ শুকনো, যেন কী-একটা ভয়ে সবাই জড়োসড়ো, কেউ আর হাসছে না।

কুঁকড়ো বললেন, "আঃ জিম্মা, দেখো দেখো ওরা আমায় ভালোবাসে কি না দেখো। আহা সবার মুখ শুকিয়ে গেছে। এরা যদি শত্রু তবে আর মিত্র কে। আজ আমার ভুল ভাঙল, এখন সবাই আমায় ভালোবাসে জেনে সুখে মরতে পারব।"

জিম্মাও একটু অবাক হয়ে গেল, এই যারা 'মার্ মার্' ক'রে কুঁকড়োকে গাল পাড়ছিল, তারাই আবার হঠাৎ বন্ধু হয়ে উঠল এমন যে কেঁদেই অস্থির! কুকুর ঘাড় নেড়ে ভালো ক'রে পাখিদের দিকে চাইলে; দেখলে, সবাই ভয়ে ভয়ে আকাশের দিকে এক-একবার চাচ্ছে

আর কুঁকড়োর কাছে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে। পাখিরা কখন্ কিভাবে থাকে জিম্মার বেশ জানা ছিল, সে কুঁকড়োকে চুপি চুপি বললে, "আমার তো বোধ হয় না ওরা তোমার প্রাণের জন্যে ভয় পেয়েছে একটুও। ভয় ওইদিক থেকে আসছে শিকরে বাজ হয়ে, আর সেটা এসে ঘাড়ে পড়বার আগে সব পাখিরা চিরকাল যা করে থাকে, আজও ঠিক তাই করছে।"

কুঁকড়ো দেখলেন আকাশের অনেক উপরে থেকে সত্যিই বাজপাখি ঘুরে ঘুরে নামছে। তার কালো ছায়াটা যেন কালো হাতের মতো একবার খানিকক্ষণ ধ'রে সব পাখিদের উপর দিয়ে যেন তাদের এক-একে গুনতে গুনতে এক পাক ঘুরে গেল ; অমনি সব পাখি ভয়ে জড়োসড়ো, আর-এক পা কুঁকড়োর দিকে এগিয়ে এল। বিপদের সময় কুঁকড়োর আশ্রয় তারা চিরকাল না চেয়েও যে পেয়েছে, বাজ অনেক বার পড়ো পড়ো হয়েছে, আর অনেকবারই কুঁকড়ো সেটাকে সরিয়ে দিয়েছেন, এবারও তা হবে না কেন। কুঁকড়ো সেই রক্তমাখা বুক ফুলিয়ে সত্যিই সোজা হয়ে দাঁড়ালেন, তার পর ঘাড় তুলে হুকুম হাঁকলেন, "আয় তোরা আয়, কাছে আয়, বুকে আয়, ভয় নেই, ভয় নেই।" অমনি বাচ্ছাগুলোকে ডানার মধ্যে লুকিয়ে নিয়ে সবাই কে কার ঘাড়ে পড়ে, ছুটে এসে কুঁকড়োর গা ঘেঁষে দাঁড়াল কাতারে কাতারে সব পাখি। পোশাকী মোরগগুলোর কাছে কেউ গেলও না, তাদের আশ্রয়ও কেউ চাইলে না। কেননা পোশাকী তারা নিজেরাই ভয়ে কাঁপছিল এ-ওকে জাপটে ধ'রে। বাজের ছায়া আবার সবার উপর দিয়ে ঘুরে চলল, এবারে আরো কালো, আরো বড়ো ; আর সবাই এমন-কি পালোয়ান হায়দারি পর্যন্ত ভয়ে গুটিয়ে যেন পালকের পুঁটলিটি। কেবল সবার উপরে মাথার মোরগ-ফুল লাল নিশেনের মতো উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে রয়েছেন কুঁকড়ো, রক্তমাখা বুক ফুলিয়ে। বাজপাখি আর-এক পাক ঘুরে এল, এবার সে একেবারে কাছে এসেছে, কালবোশেখের মেঘের মতো কালো হয়ে উঠেছে তার ভয়ংকর কালো ছায়া ; সমস্ত যেন অন্ধকার করে আসছে সেটা আস্তে আস্তে। ভয়ে মায়ের বুকের মধ্যে বাচ্ছাগুলো পর্যন্ত কাঁদতে থাকল। সেই সময় কুঁকড়োর সাড়া আকাশ ভেদ করে উঠল, "অব্‌তক্ হাম জিন্দা হ্যায়, অব্‌তক্ হাম দেখতা হ্যায়, অব্‌তক্ হাম মালেক হ্যায়···।"

অমনি দেখতে দেখতে বাজের ছায়া ফিকে হতে হতে কোথায় মিশিয়ে গেল। আকাশ যে

পরিষ্কার সেই পরিষ্কার নীল ঝকঝক করছে। আহ্লাদে পাখিরা সব আবার গা ঝাড়া দিয়ে যে যার জায়গায় উঠে বসে বললে, "এইবার আবার কুস্তি চলুক।" জিম্মা অবাক হয়ে গেল ; কুঁকড়োর মুখে কথা সরল না, সোনালি বললে, "তুমি ওদের বাঁচালে আর ওরা তার পুরস্কার দেবে না ? বাজ দেখালে ভয়, তার শোধ তুলবে ওরা তোমায় মেরে !"

কিন্তু কুঁকড়ো জানেন আর তাঁর মরণ নেই ; যে-পাখিকে সবাই ভয় করে, সেই বাজের কালো ছায়া তিনবার তাঁর মাথার উপর দিয়ে ঘুরে গেছে, ভয় থেকে তিনি সবাইকে বাঁচিয়েছেন, এখন নিজে তিনি নির্ভয়ে যুদ্ধের জন্যে এগিয়ে এসে হায়দারিকে এক গোঁত্তা বসিয়ে বললেন, "আও।" গোঁত্তা খেয়ে হায়দারি ঠিকরে বেড়ার উপর গিয়ে পড়ল। এবার ইস্পাতের পেরেক-আঁটা কাতান কুঁকড়োর উপর চালাবার মতলব ক'রে সে দুপায়ে বাঁধা ছোরাদুটোয় শান দিয়ে নিতে লাগল। বেরাল গাছের উপর থেকে হায়দারিকে বললে, "কেঁও মিঁয়া।"

চড়াই বললে, "কাতানি কাটকাটানি।"

জিম্মা বললে, "চালাক দেখি, ও কাতান, ওর টুঁটি ছিঁড়ব না !"

আবার কুস্তি চলল। জিম্মা দেখছে হায়দারিটা ছোরা না চালায়, এমন সময় হঠাৎ হায়দারি সাঁ ক'রে ছোরা উঁচিয়ে 'লেও' ব'লেই যেমন কুঁকড়োকে কাতান বসাবে, অমনি কুঁকড়ো এক প্যাঁচ দিয়ে তাকে উলটে ফেললেন। হায়দারির নিজের কাঁটা তার নিজেরই বুকে কেটে বসল। হায়দারি পড়লেন। তার বন্ধুরা তাকে ধরাধরি ক'রে উঠিয়ে নিয়ে পালাল। পাখিরা সব "দুও দুও" ক'রে তার পিছনে চলল। সোনালি আর জিম্মা কুঁকড়োর কাছে ছুটে এসে দেখলে, তিনি চোখ বন্ধ করে চুপচাপ বসে আছেন।

জিম্মা বললে, "আমরা এসেছি বন্ধু, আমাদের সঙ্গে কথা কও।"

সোনালি বললে, "আমি এসেছি একটিবার চেয়ে দেখো।"

কুঁকড়ো আস্তে-আস্তে চোখ মেলে বললেন, "ভয় নেই, কালও আবার সূর্য উঠবে, আলো ফুটবে।" এদিকে হায়দারিকে 'দুও' দিয়ে তাড়িয়ে সব পাখি কুঁকড়োকে 'জয় জয়' ব'লে খাতির করতে এল।

কুঁকড়ো রেগে হাঁকলেন, "ছুঁও মৎ, তফাত রও।"

জিম্মা বললে, "আর কেন। কে কেমন তা বোঝা গেছে, সরে পড়ো।"

সোনালি বললে, "সত্যিকার পাখি যদি থাকে তো সে বনে, তোরা কি পাখি।" তার পর কুঁকড়োর দিকে ফিরে সোনালি বললে, "চলো, আর এখানে কেন, বনে চলে যাই চলো।"

কুঁকড়ো বললেন, "না, আমাকে এখানেই থাকতে হবে।"

"এত কাণ্ডের পরেও, সব জেনেও?" সোনালি অবাক হয়ে শুধোলে।

কুঁকড়ো জবাব দিলেন, "হাঁ, সব জেনেও থাকতে হবে।"

সোনালি অবাক হয়ে রইল। কুঁকড়ো আবার বললেন, "হাঁ সোনালি, এখন শুধু আমার গানের জন্যেই থাকব, আর কারু জন্যে নয়। মনে হচ্ছে এ দেশ ছাড়লে বিদেশে বিভুঁয়ে গান আমার শুকিয়ে মরবে। আঃ, এই আকাশ, এই দিন— একে আবার আমি গান গেয়ে আলো দিয়ে কাল জাগিয়ে তুলব, মরতে দেব না।" পাখিগুলো আবার মুখ কাঁচুমাচু করে কুঁকড়োর দিকে এগিয়ে এল। তিনি ঘাড় নেড়ে মানা করলেন, "না, আর না, কেউ না, এখন শুধু আমি আর আমার গান, আর আমার কেউ নেই, কিছু নেই, সরে যাও, আমি দিনের আসা গাই।" সব পাখিরা দূরে সরে গেল; কুঁকড়ো সোজা দাঁড়িয়ে সুর ধরলেন, "আ-আ-আ···।" কিন্তু এ কী। গান কোথায় গেল। তাঁর মনের ভিতর ঘুরছে— সা-সা-সা। তিনি আবার চাইলেন গাইতে, অমনি মনে হল সুরটা ওড়ব না খাড়ব? ওটা পঞ্চম না ধৈবত। তেতালা না চৌতালা? এমনি সব নানা শাস্ত্রের বিড়বিড় হিজিবিজি তাঁর গলার মধ্যে বুকের মধ্যে ঘট্‌ঘট্‌ করতে লাগল। কুঁকড়ো নিশ্বেস ছেড়ে বললেন, "হায় আমার গান পর্যন্ত রাখলে না; সব কেড়ে নিলে— কোথায় আমার গান।" ব'লে কুঁকড়ো ঘাড় হেঁট করলেন।

সোনালিয়া কাছে ছুটে এল, কুঁকড়ো তার বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে কেঁদে বললে, "তুমি ছাড়া আর কেউ নেই, তোমার ভালোবাসা ছাড়া আর কিছু নেই জগতে, ও আমার স্বপন-পাখি।" সোনালি আস্তে-আস্তে বললে, "চলো চলে যাই, যেখানে কেবলই গান আর ফুল ফুটছে সেই বন, সেখানে সা-রে-গা-মা-ব'লে কেউ মাথা বকায় না— দিনরাত গেয়েই চলে।"

কুঁকড়ো সোনালিকে বললেন, "যাব, তোমার সঙ্গেই যাব, দুজনে যাব, শুধু যাবার আগে এদের একবার চোখ ফুটিয়ে দিয়ে যাব।" ব'লে কুঁকড়ো সবাইকে ডেকে বললেন, "ওগো

কুলতলার নিষ্কর্মার দল! এই সবজি-বাগান হাওয়া খাবার জায়গাও নয়, গুল্‌তোন করবার আড্ডাও নয়, এখানে কাজ চলেছে, ফুল থেকে ফল আস্তে-আস্তে তৈরি হচ্ছে, হট্টগোলের জায়গা এটা নয়, ওই শোনো মৌমাছিরাও এই কথাই বলছে।" অমনি সব মৌমাছি ব'লে উঠল, "কাজের সময়, সরো না মশয়! সরো না মশয়! এসো না মশয়! এসো না মশয়!"

তার পর মুরগিদের ডেকে কুঁকড়ো বললেন, "ওই-সব পোষা মোরগের পালক দেখে ভুলো না। ভুলো না। যে ধান ছড়ায় তারি কাছে ওরা ছুটে যায়, গোলাম ব'নে সেলাম বাজায়। ওদের সবখানিই মিথ্যে দিয়ে গড়া, সত্যির মধ্যে কেবল ওদের পেটটি। আর ময়ূর তোমাকে বলি, দেব-সেনাপতির বাহন ব'লে বিধাতা তোমায় ভালো সাজ দিয়েছেন কিন্তু তাই ব'লে সাহস ব'লে জিনিস তোমায় একটুও তিনি দেন নি; দিয়েছেন তোমার বুকের মধ্যে হিংসে আর দেমাকের বিষ এমনি ভাবে যে তোমার গলার খানিক পালক পুড়ে কালি হয়ে গেছে; আর তোমার ল্যাজের ডগাটি পর্যন্ত হয়ে গেছে নীল, পাছে কারু বাড় দেখতে হয় সেই ভয়ে।"

চড়াই অমনি ব'লে উঠল, "ছুট্।"

কুঁকড়ো চড়ায়ের দিকে ফিরে বললেন, "কী কুক্ষণে শহুরে চড়ায়ের সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল বনের তাল চড়াই, সেই থেকে কেবলই তুমি ভয়ে-ভয়ে আছ, পাছে কেউ তোমার শহুরে খোলস খুলে নেয়। নকল-শহুরে! তোমার চলন নিজের নয়, বলন নিজের নয়, কেননা তোমার আনন্দ নেই, আছে কেবল ধরা-পড়বার ভয়। তুমি নিজেকে পছন্দ কর না কাজেই অন্যকেও ভালোবাস না। তোমার কী নাম দেব? তুমি জ্বলন্ত সল্‌তের পোড়া গুল, তোমাকে কাঁচি দিয়ে ছেঁটে দেওয়াই দরকার।"

চিনি-দিদি ব'লে উঠলেন, "বেশ বেশ।"

চড়াইটা ল্যাজ-গুড়িয়ে এক কোণে সরে পড়ল, আর পেরুর উপরে এই অপমানের ঝালটা ঝাড়তে গেলে কোনো বিপদে পড়বে কি না সেটা মনে মনে বিচার করতে লাগল। ঠিক এই সময় দূর থেকে চিড়িয়াখানার মালিক ডাক দিলেন, "আয়—আঃ—আয় আঃ!" অমনি সব পোশাকী মোরগ সেই দিকে দৌড় দিলে।

চিনি-দিদি বললেন, “চললে নাকি। চললে নাকি।” ব’লে তাদের সঙ্গে ছুটলেন।

সোনালি কুঁকড়োকে বললে, “আর কেন? চলো এইবার।” ব’লে কুঁকড়োকে নিয়ে বনের দিকে আস্তে আস্তে চলে গেল। জিম্মা ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে সেইদিকে খানিক চেয়ে থেকে আস্তে আস্তে গোলাবাড়িতে ফিরে গেল মাথা নাড়তে নাড়তে।

চিনি-দিদি ফিরে দেখলেন সবাই চলে গেছে। তিনি তবু যেন সবাইকে খাতির ক’রে বেড়াতে লাগলেন আর কেবলই বলতে লাগলেন, “আসছে সোমবারে আসবে তো? নমস্কার। মনে থাকে যেন আসছে সোমবার।”

খালি উঠোনময় চিনি-দিদি ঘুরে বেড়াচ্ছেন এইভাবে, এমন সময় কাক ফুকরোলে, “কাছিম মিয়া, কাছিম মিয়া”…। চিনি-দিদি তার ছেলেকে বলছিলেন, “আঃ, আজ মজলিস্ কেমন জমেছিল দেখিছিস্!” গুটি-গুটি কাছিম এসে কুলতলায় বসলেন।

৭

বনে বসন্তকাল এসেছে। চমৎকার দিনগুলি— আলো-ছায়ায় নিবিড় বনের সবুজে ঢাকা পথে-পথে, আর নিস্তব্ধ রাতগুলি— রাঙা-ফুলে ঢাকা অশোক গাছের দোলনায়, কুঁকড়ো আর সোনালিয়া দুটিতে আনন্দে কাটাচ্ছেন। এমন সবুজ, এমন ঠাণ্ডা ছায়ায় ছায়াময় সে বন, যেন মনে হয় মায়ের কোলে এসেছি। সেইখানে কুঁকড়ো আস্তে আস্তে সব কষ্ট ভুলতে লাগলেন। সকাল থেকে সন্ধে তিনি বেড়িয়ে বেড়ান, একলাটি। চারি দিকে বড়ো বড়ো দেবদারু আর ঝাউ, এত পুরোনো যে তাদের বয়স কেউ জানে না। ডালে ডালে সব সবুজ শেওলা জটার মতো ঝুলে পড়েছে; শিকড়গুলো তাদের পাথর আঁকড়ে কোন্ পাতালে যে নেমে গেছে তার ঠিক নেই। কোথাও ঝুর-ঝুর করে পাতা ঝরছে, কোথাও ঝাউ ফলগুলোয় মাটি একেবারে বিছিয়ে গেছে। একটা নালার ধারে ঝরনা ঝরছে, তারি এক পাশে ব্যাঙেরা ছতরি বেঁধে হাট বসিয়েছে।

কত রকমের পাখি গাছে গাছে। কাঠবেরালি সব বাদাম-গাছের ডালে-ডালে লাফালাফি করে বেড়াচ্ছে; খরগোস ঘাসের মধ্যে লুকোচুরি আর কপাটি খেলছে। বনে এসেই খরগোস-গুলোর সঙ্গে কুঁকড়োর ভাব হয়ে গেল; কিন্তু তারা ফ্যাল্-ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে থাকে, সোনালিয়া সেটা সইতে পারে না; এক-একদিন কুঁকড়োর আড়ালে ডানার ঝাপটা দিয়ে তাদের ভয় দেখাতে ছাড়ে না।

একটা কাঠঠোকরার সঙ্গে কুঁকড়োর খুব জমে গেল। অশোক-গাছটার পাশেই একটা কাঁঠাল গাছে তার কোটর। দিনের মধ্যে দশবার সে কুঁকড়োর সঙ্গে গল্প করতে এসে হাজির হয়। সোনালিয়া কিন্তু এটা ভারি অপছন্দ করে; সময় নেই, অসময় নেই, এলেই হল? শেষে কাঠঠোকরার সঙ্গে বন্দোবস্ত হল, আসবার আগে সে তিনবার ঠুকঠুক আওয়াজ দিয়ে তবে আসবে।

কিন্তু কাঠঠোকরার গল্প শুনতে কুঁকড়ো সত্যি ভালোবাসেন; সে যে কত কালের সব পাখিদের কথা জানে, তার ঠিক নেই।

একদিন সন্ধেবেলা কাঠঠোকরা কুঁকড়োকে সন্ধ্যা-পাখির গান শোনালে। সে অতি চমৎকার। দুটি টুনটুনি সুর ধরলে আর বনের সব পাখি তাদের গানে আস্তে আস্তে যোগ দিলে। প্রথম পাখিটি গাইলে, "ও আমাদের বন্ধু!" জুড়ি-টুনটুনিটি অমনি ধরলে, "ও অনাথের নাথ!" হাজার হাজার পাখির মিষ্টি সুর অমনি গাছে গাছে সাড়া দিলে, "ওগো বন্ধু। ওগো বন্ধু।" তার পরে বন্দনা শুরু হল—

"নমস্কার নমস্কার! আকাশে নমস্কার, আলোতে নমস্কার, আভাতে নমস্কার, বাতাসে নমস্কার, রাতে নমস্কার, দিনে নমস্কার— তোমাকে নমস্কার। তোমার দেওয়া চোখের আলো, তোমার দেওয়া মিষ্টি জল, তোমার এই ঘন বন, তোমার এই মধু ফল, তোমার এই কাঁটার বেড়া, তোমার এই সবুজ ঘাস। মিষ্টি সুর এও তোমার, তোমার এ নিশ্বাস। তোমার এই পাতার বাসা, তোমার এই ছোটো পাখি। আমার এই ছোটো সুরে তোমারেই আমি ডাকি।···ছোটো বাসার ছোটো পাখি— সন্ধ্যা হল তোমায় ডাকি, দিনের শেষে তোমায় ডাকি, বন্ধু এসো, তোমায় ডাকি।"

এ পাখি থেকে ও পাখি, এ গাছ থেকে ও গাছ, এমনি ক'রে বনের শেষ পর্যন্ত "বন্ধু এসো"

ব'লে সবাই ডাক দিয়ে গেয়ে উঠল। কুঁকড়োও ডাক দিলেন, "বন্ধু বন্ধু!" তার পর একটি একটি ক'রে সব ছোটো পাখিরা পাতার আড়ালে ঘুমিয়ে পড়ল। দেখতে দেখতে চাঁদের আলো বনের ফাঁক দিয়ে অন্ধকারের মধ্যে ঝরনার মতো নেমে এল— লতাপাতার কিনারায়, পাথরের উপর, শেওলার গায়ে। কুঁকড়ো দেখলেন, একটুখানি মাকড়সার জালে হীরের মতো কী ঝলক দিচ্ছে। মনে হল, বুঝি একটা জোনাক-পোকা জালে পড়েছে। কাছে গিয়ে দেখেন, বিষ্টির একটি ফোঁটায় চাঁদের আলো এসে লেগেছে। এমনি সব নূতন-নূতন কত কী দেখতে দেখতে সেই মহাবনে কুঁকড়োর দিন আর রাতগুলি আনন্দে কাটছে।

বনে ফিরে এসে কুঁকড়ো আবার তাঁর গান ফিরে পেয়েছেন। কিন্তু কেবল সকালের গানটি ছাড়া সোনালি তাঁকে আর-একটি গানও গাইতে দেবে না— তাও আবার সকালটা যদি সোনালির গায়ের পালকের চেয়েও রঙিন আর জমকালো হয়ে দেখা দেয় তবেই। কুঁকড়ো সোনালিকে বলেন, "এই আলোতেই আমাদের সেদিনের মিলন, সেটা ভুললে চলবে না সোনালি। আলোর জয় আমাকে দিতেই হবে সারাদিন।" সোনালি বলে, "তুমি আমার চেয়ে আলো-কে কেন ভালোবাসবে।"

ইতিমধ্যে একদিন চক্‌চকে সবুজ এক সোনাল-পাখির সঙ্গে সোনালির দেখাশুনো হয়েছে, আর গহন-বনের একটা নির্জন পথে দুটিতে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে এটা কুঁকড়োর চোখ এড়াল না। কিন্তু মনের দুঃখ মনেই রেখে কুঁকড়ো ভাবলেন, "আমি কি বলতে পারি, কেন তুমি সোনালকে বেশি পছন্দ করবে আমার চেয়ে সোনালি? আকাশ কি কোনোদিন তাতে-পোড়া পৃথিবীকে বলতে পারে— তুমি বিষ্টির ফোঁটাগুলিকে রোদের চেয়ে কেন ভালোবাসবে? না, মাটিই বলতে পারে আকাশকে— তুমি বিষ্টিকেই বরণ করো, আলো-কে চেয়ো না! সোনালিয়া, সে বনের দুলালী, অরণ্য তো তাকে আমার সঙ্গে বাইরে— দূরে পাঠাতে পারবে না; সে দূত পাঠিয়েছে ঘন বনের সবুজ সোনাল-পাখিটি; ওরি সঙ্গে কোন্‌দিন চলে যাবে ঝরা ফুল ঝরা পাতার স্বপ্ন-বিছানো গহন-বনের অন্দরের পথে সোনার আঁচলে ঝিলিক দিয়ে সোনার পাখি। আর আমি" —ব'লে কুঁকড়ো নিশ্বাস ফেললেন।— "কাঠঠোকরা ঠিকই বলে, 'যেখানে যার বাসা, সেইখানেই তার ভালোবাসা।' আমার সবই সেই পাহাড়তলির আকাশের নীচে

—আর সোনালির সবই এই বনের তলায় যেদিন দেখা দেবে, সেদিন তো কেউ-কাউকে 'যেয়ো না' ব'লে রাখতে পারব না ; কেবল এইটুকুই সেদিন বলবার থাকবে— ভুলো না বন্ধু, মনে রেখো।"

সে আর-একদিন ; দুজনে অশোক-তলাটিতে দাঁড়িয়ে ; সূর্য অস্ত গেছে ; সন্ধ্যার পাখিদের গান বন্ধ হয়েছে ; দু-একটা কাঠবেরাল তখনো পাতার মধ্যে উস্‌খুস্ করছে ; খরগোসগুলো তাদের গড়ের বাইরে বসে একটু সন্ধের বাতাসে জিরিয়ে নিচ্ছে ; বন আস্তে-আস্তে নিঝুম হয়ে আসছে। রাত্রির অন্ধকারে গাছ সব ক্রমে যেন মিলিয়ে গেল ; সেই সময় ক্রমে-ক্রমে চাঁদের আলো ঘুমন্ত বনে এসে পড়ল। সে রাতের মতো বিদায় নেবার জন্যে সোনালি কুঁকড়োকে "আসি" বলতে গিয়েই দেখলে খরগোসগুলো চোখ প্যাঁট-প্যাঁট ক'রে তাদের দিকে দেখছে। অমনি এক ডানার ঝাপটায় সোনালি তাদের তাড়িয়ে দিয়ে বললে, "আসি তবে।" কুঁকড়ো বললেন, "দেখো, মনে রেখো।" সোনালি বিদায় নিয়ে অশোক ফুলের গাছে তার মনোমত ডালটির উপরে উড়ে-বসতে ফিরে দাঁড়িয়েছে, এমন সময় পায়ে তার কী-একটা ঠেকল। 'ইস্' ব'লে সোনালি সরে দাঁড়িয়ে দেখলে কী, সে তো কিছু বুঝতে পারলে না। কুঁকড়ো কাছে এসে দেখে বললেন, "সর্বনাশ, এ যে ফাঁদ পাতা রয়েছে। কে এখানে ফাঁদ পাতলে ?" টুক্ টুক্ টুক্ তিনবার আওয়াজ দিয়ে সবুজ ফতুয়া লাল-টুপিটি মাথায় কাঠঠোকরা কোটর থেকে বেরিয়ে বললেন, "ফাঁদটা বাঁচিয়ে চোলো, ওই গোলাবাড়ির মানুষটিই ফাঁদ পেতেছে, সোনালিয়াকে ধরবে ব'লে।" "আমাকে ধরা তার কর্ম নয়।"—ব'লে সোনালি মাথা ঝাড়া দিলে। কাঠঠোকরা বলল, "শুনলুম সে তোমাকে ধ'রে পোষ মানাবে।" কুঁকড়ো বললেন, "তিনি খুব ভালো লোক, যদি তুমি ধরা পড়তে, তবে তোমাকে তিনি কষ্ট দিতেন না, এটা আমি ঠিক বলতে পারি।" সোনালি বললে, "কষ্ট না দিন, কিন্তু প্রাণ থাকতে সোনালি তার পোষ মানত না, সেটাও ঠিক।"

ফাঁদ পাতা হলে বনের সবাই সবাইকে সাবধান না ক'রে নিশ্চিন্ত হতে পারে না, তাই খরগোস এসে বললে, "দেখো, খবরদার ওই কলটাতে যেন পা দিয়ো না ; ছুঁয়েছ কি।—"

"বোকো না তুমি। ফাঁদে যে আটকায় কেমন-ক'রে তা আমি খুব জানি। এক কুকুর ছাড়া আর কাউকে আমি ডরাই নে। ঘরে যাও, ঠাণ্ডা লাগবে।"—ব'লে সোনালি আস্তে ডানার ঝাপটা

দিয়ে খরগোসকে বিদায় ক'রে কুঁকড়োকে বললে, "আমি একবার গোলাবাড়ির দিকে যাচ্ছি।"

কুঁকড়ো ব্যস্ত হয়ে ব'লে উঠলেন, "কেন। কেন। সেখানে কেন।" "ও-দিককার কুকুর-গুলোকে একটু দৌড় করিয়ে আসি। এই এক-পা এখানে, এক-পা ওখানে, যাব আর আসব, দেরি হবে না।"

সোনালি চলে গেল, কুঁকড়ো অনেকক্ষণ সেদিকে চেয়ে থেকে, গাছের উপর কাঠঠোকরাকে শুধালেন, "সোনালিকে দেখতে পাচ্ছ কি।" কাঠঠোকরা উঁচু ডাল থেকে গলা বাড়িয়ে দেখে বললেন, "না, তিনি গেছেন।" কুঁকড়ো বললেন, "তুমি ভাই, একটু নজর রেখো তো, সে আসছে কি না। আমি একবার গোলাবাড়ির চড়াইটার সঙ্গে কথা কয়ে নিই।"

কাঠঠোকরা আশ্চর্য হয়ে ব'লে উঠল, "চড়াই না তোমার শত্রু?"

কুঁকড়ো বললেন, "কিন্তু খবর দিতে আর তার মতো জুটি নেই। খবর যা চাও, তার কাছে পাবে।"

"চড়াই আসছেন নাকি।" কাঠঠোকরা শুধলে।

কুঁকড়ো বললেন, "না। এই দেখো-না তাকে ফোঁ করি। এই যে নীল ধুঁতরো ফুলটা দেখছ, এর সঙ্গে মাটির মধ্যে দিয়ে তারের মতো সরু শিকড় দিয়ে গোলাবাড়ির পুকুরধারে শ্বেত ধুঁতরো ফুলের যোগ আছে। ফুলের ভাষা ব'লে কবিতার বইয়ে পড়েছ তো। একেই বলে ফুলে-ফুলে কানাকানি।"

বনের মধ্যে যে এমন কল আছে কাঠঠোকরা তা জানত না। ফোঁ কেমন, দেখতে সে ব্যস্ত হল। কুঁকড়ো ফুলের মধ্যে মুখ দিয়ে ডাকলেন, "হ্যালো।" খানিক ঘর্-ঘর্ শব্দ হল।— "হ্যালো চড়াই। গোলাবাড়ি।" কাঠঠোকরা বলে উঠল, "কুঁকড়ো ভাই, তোমার তো সাহস কম নয়। বাসার একেবারে দরজায় দাঁড়িয়ে কথা-চালাচালি। সোনালি টের পেলে—।"

কুঁকড়ো বললেন, "সেখান থেকে যখন কথা আসবে তখন এই ফুলের মধ্যে যে মৌমাছিটা আছে, সে জেগে উঠবে আর—।"

'বোঁ-ও-ও' শব্দ হল। অমনি কুঁকড়ো ফুলে কান দিয়ে "চড়াই নাকি" বলে খানিক আবার শুনে বললেন, "ওঃ তাই নাকি। আজ সকালে—।"

কাঠঠোকরা শুধলে, "কী বলছে ? কী ?"

কুঁকড়ো বললেন, "দুকুড়ি দশটা মুরগির বাচ্ছা ফুটেছে ?" তার পর আবার একটু শুনে বললেন, "বলো কী। তম্মার ভারি ব্যায়রাম !"

কী একটা গোল বাধল। কুঁকড়ো বললেন, "রোসো, রোসো। কী। ভালো শোনা যাচ্ছে না হে। আঃ, মশাগুলো জ্বালালে। চড়াই, আঃ, হাঁ হাঁ তারপর, জিম্মাকে নিয়ে তারা শিকারে বেরবে। বল কী হে। "জিম্মা গোলাবাড়ির একজন।"—কাঠঠোকরাকে এই ব'লে কুঁকড়ো আবার ফোঁ ধরলেন, "কী বললে ? আমি চলে আসবার পর থেকে সব কাজে গোলমাল চলেছে ? এ তো জানা কথা··· এই সেদিন এসেছি এরি মধ্যে··· যেতে হবে··· তাই তো কী করা যায় হে··· যাব নাকি। কী বল।" কাঠঠোকরা চুপিচুপি বললে, "সোনালি আসছেন।" কিন্তু কুঁকড়ো তখন মন দিয়ে কানে ফুলটা চেপে ধরেছেন, কাঠঠোকরার কথা তাঁর কানেই গেল না। কথা চলল, "কী বললে ? হাঁসগুলো সারারাত লাঙলটার তলায় ঘুমিয়েছে ? বল কী !" কাঠঠোকরা কুঁকড়োকে বলছে, "থাক্, দেখো, চুপ।" কিন্তু কিছু ফল হচ্ছে না। ওদিকে সোনালি এসে উপস্থিত। কাঠঠোকরাকে ইশারায় চুপ করতে ব'লে সোনালি কুঁকড়োর পিছনে লুকিয়ে দাঁড়াল।

ফোনে কুঁকড়ো বললেন, "বল কী, সব কজনেই ? ওঃ ময়ূরটা তা হলে মাটি হয়েছে বলো।"

কাঠঠোকরা আবার মুখ বার করতেই সোনালি তার দিকে এমনি চোখ রাঙিয়ে উঠল যে সে তাড়াতাড়ি কোটরে যেমন সেঁধবে, অমনি দরজায় মাথা ঠুকে ফেললে। কুঁকড়ো ফোনে বললেন, "মুরগিরা সব··· আঃ, ভালো আছে শুনে খুশি হলেম··· গান ? ওঃ গান করি বৈকি। হাঁ রোজ। কিন্তু এখান থেকে একটু দূরে··· ওই যে দিঘিটা আছে, তারি ধারে। হাঁ, নিত্যি নিত্যি, ঠিক আগেরই মতো।"

রাগে সোনালি লাল হয়ে উঠল ; তাকে লুকিয়ে গান গাওয়া হয়। এত বারণ করলুম···।

কুঁকড়োর কথা চলল, "সোনালি গাইতে মানা করে, তাই লুকিয়ে আমি আলো আনছি আজকাল।" সোনালি এক-পা কুঁকড়োর দিকে এগিয়ে শুনলে, কুঁকড়ো বলছেন, "যখন

সোনালির কালো চোখদুটি ঘুমে ঢলে পড়ে, যখন তার সোনার দেহটি আলিসে লুটিয়ে চমৎকার দেখতে হয়", সোনালির মুখে এবার হাসি ফুটল। "···সেই সময় আমি পা-টিপে-টিপে শিশিরের উপর দিয়ে দূরে গিয়ে, আলোর জন্যে যে-ক'টি গান সব ক'টি গেয়ে, যেমনি দেখি অন্ধকার ফিকে হচ্ছে, অমনি আস্তে আস্তে বাসায় ফিরি।··· কী বলছ? শিশিরে পা ভিজে দেখে সে সন্দেহ করবে? তাই যদি হবে, তবে ডানার পালকগুলো আছে কী করতে। পা-দুটো মুছে নিতে কতক্ষণ। তার পর আস্তে আস্তে অশোকের ডালে ব'সে যে-গান সে গাইতে মানা করে নি, সেইটে গেয়ে তার ঘুম ভাঙাই।"

সোনালি আর রাগ সামলাতে না পেরে ফোঁস করে উঠল। কুঁকড়ো ঘাড় ফিরিয়ে তাকে দেখেই চটপট ফোনে বললেন, "নাঃ কিছু না, আর-একদিন হবে এখন।"

সোনালি বললে, "আমাকে ঠকালে কেন।"

ফোনটা শব্দ করলে, "ফুর্-র।"

কুঁকড়ো বললেন, "আমি তোমাকে—"

"ফুর্-র", আবার ফুলের মধ্যে মাছিটা ডাকলে। কুঁকড়ো ফুলটার উপর ডানা চাপা দিলেন, কিন্তু সেটা ক্রমাগত "ফুর-র্-র্-র্-র্-র্" ব'লেই চলল।

সোনালি খুব রেগে বললেন, "কী নির্দয় তুমি ঠগ।···কেন শুধচ্ছ। তুমি মুরগিদের খবর নিতে এতক্ষণ ব্যস্ত ছিলে না? কে কোথায় ঘুমোয়, কে কী খায়, কার কটি ছানা হল? গোলাবাড়ির বাইরেও যে ডালকুত্তোটা তার পর্যন্ত খবর নেওয়া হচ্ছে। এও না-হয় সইলুম কিন্তু ভোরবেলায় ডানায় পা মুছে চুপি চুপি··· ওঃ বুঝেছি, তুমি একলা এই সোনার পাখিটাকেই ভালোবাস, কেমন?"

কুঁকড়ো খানিক চুপ থেকে বললেন, "সোনালি, ভেবে দেখো, এই হৃদয়ের মধ্যে আলোটি যদি না দেখতে পেতে তবে কি এখানে আসতে তোমার ইচ্ছে হত। হৃদয়ের মধ্যে কিছু না থাকার চেয়ে আলো থাকা কি ভালো নয়। রঙিন-আলো-দিয়ে-গড়া সোনালিয়া। আমি আলো-কে ভালোবাসি তাই তোমাকেও ভালোবাসতে পেরেছি, আলোর দিকে হৃদয় পেতে যদি প্রতি-দিন না দাঁড়াতেম, তবে ভালাবাসার ফোয়ারা যে এতদিনে শুকিয়ে যেত সে কি জান না।"

কুঁকড়োর কথায় সোনালির অভিমান বাড়ল বৈ কমল না। সে ঝগড়া করতে লাগল। কান্নাকাটি ক'রে ক'রে পাড়া জাগিয়ে তোলবার জোগাড় করলে। কুঁকড়োও একটু যে চটেন নি তা নয়। শেষ সোনালি বললে, "আচ্ছা আমার যদি মান রাখতে চাও, তবে কাল সকালে একেবারে গাইবে না বলো।"

কুঁকড়ো বললেন, "এ কী কথা। সমস্ত পাহাড়তলিটা যে অন্ধকার হয়ে থাকবে।" সোনালি ঠোঁট ফুলিয়ে বললে, "না-হয় থাকলই। তোমারই-বা কী, আমারই-বা কী।" কুঁকড়ো ঘাড় নাড়লেন, "তা হতে পারে না। একদিন আলো বন্ধ! সব যে ধ্বংস হয়ে যাবে। আমাকে গাইতেই হবে।"

সোনালি বললে, "আচ্ছা, যদি প্রমাণ করে দিই, তুমি না থাকলেও সকাল হতে কিছু বাধল না, তখন ?"

কুঁকড়ো একটু হেসে বললেন, "তখন সোনালি আমি সেখান থেকে তোমার সঙ্গে ঝগড়াও করতে আসব না, আর আলো হল কি না হল সে খবরও জানতে খুব উৎসাহ করব না। কেননা যেদিন আমি-ছাড়া হয়ে আলো উঠবে, সেদিন আমি তো আর কুঁকড়ো নেই, আমি যে আলোর আলোয় গিয়ে মিশেছি।"

সোনালির চোখে জল ভরে উঠলে সে কেঁদে বললে, "একটি দিন আমার কথা রাখো।"

কুঁকড়ো ঘাড় নাড়লেন, "না, হতে পারে না।"

সোনালি বললে, "ভুলেও কি একদিন আমার কথা রাখতে নেই গা।"

কুঁকড়ো বললেন, "ভুল হবার যোটি নেই। অমনি অন্ধকার বুকে চেপে বলে, ডাক্ আলো-কে।"

সোনালি বলে উঠল, "অন্ধকার ওঁর বুকে চেপে ধরে ? সব বাজে কথা। বলো-না বাপু গান গাও— সবাই তোমার তারিফ করবে ব'লে। গানের তো ওই ছিরি, এর জন্যে মিছে কথা কেন বাপু। তোমার গান শুনে তো বনের সবাই মোহিত হল। এখানকার বাবুই-পাখি, সেও তোমার চেয়ে গায় ভালো।"

কুঁকড়ো বললেন, "হতে পারে বাবুই গায় চমৎকার, কিন্তু সেইজন্যে অভিমানে আমি গাওয়া বন্ধ করব, তেমন কুঁকড়ো আমায় ভাবলে নাকি।" সোনালি রেগেই বলে চলল,

"যেখানে নীচের বনে রোদের বেলা বসন্ত বাউরির গানটি মিনতি জানায়, আর উপরের বনে সা-বুলবুল গানের ফোয়ারা খুলে দেয়, সেই বনের মধ্যে কুঁকড়োর ডাক কেউ শুনতে চাইবে, এটা পাগল ছাড়া আর কেউ বিশ্বাস করতে পারে না।"

কুঁকড়ো কোনো কথা না কয়ে তফাতে সরে দাঁড়ালেন। সোনালি তবু বললে, "শুনেছ কোনো-দিন নিশুত রাতের স্বপনপাখির গান?" "শুনি নি।" ব'লে কুঁকড়ো অশোকের ডালে উঠে বসলেন। সোনালি নিজে নিজেই বলে যেতে লাগল, "স্বপনপাখির গান, সে এমন আশ্চর্য ব্যাপার যে প্রথমবার শুনতে শুনতে", হঠাৎ সোনালির কী একটা বুদ্ধি মাথায় জোগাল; সে চুপ হয়ে ভাবতে লাগল।

কুঁকড়ো শুধলেন, "কী বলছিলে?" সোনালি চেঁচিয়ে বললে, "নাঃ, কিছু নয়।" আর মনে-মনে হেসে বললে, "এইবার ঠিক হবে। উনি তো জানেন না যে স্বপনপাখির গান শুনতে শুনতে রাত কখন্ যে ভোর হয়ে যায়, কেউ বুঝতে পারে না।"

কুঁকড়ো গাছের উপর থেকে নেমে এসে সোনালিকে বললেন, "কী বলছিলে।"

"কিছু না।" বলে সোনালি মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াল।

৮

ঘাসের মধ্যে থেকে ব্যাঙ আওয়াজ দিলে, "কর্তা, ঘরে আছেন? কর্তা।" সোনালি "ও মাগো ব্যাঙ।" ব'লে একলাফে একটা গাছের কোটরে গিয়ে লুকোল। ছ'-ছ'টা কোলাব্যাঙ এসে উপস্থিত। তার মধ্যে সব চেয়ে বড়ো ব্যাঙ এসে হাত নেড়ে কুঁকড়োকে বললে, "বনে চিন্তাশীল যাঁরা, তাঁদের হয়ে আমরা এসেছি ধন্যবাদ জানাতে গানের ওস্তাদ আপনাকে··· ওর নাম কী, অনেক গানের আবিষ্কর্তাকে", আর একজন থপ্ করে বললে, "জলের মতো সহজ গানের", অমনি তৃতীয় ব্যাঙ থপ্ থপ্ করে বললে, "যত-সব ছোটো গানের", অমনি অন্যে বললে, "মজার গানের।"

পঞ্চম, ষষ্ঠ, তারাও থপ্ থপ্ ছপ্ ছপ্ করে এগিয়ে এসে বললে, "সব বড়ো বড়ো গানের··· সব পবিত্র গানের।"

ব্যাঙেদের কুঁকড়োর মোটেই ভালো লাগছিল না, কিন্তু ভদ্রতার খাতিরে তিনি তাদের বসতে বললেন। একটা মস্ত ব্যাঙের ছাতা টেবিলের মতো পাতা রয়েছে, তারি চারি দিকে সবাই বসলেন। সদালাপ চলল। ব্যাঙ বিনয় করে বললেন, তাঁরা কিছুই নয়, অতি হীন। কুঁকড়ো বললেন, "কিন্তু বড়ো বড়ো চোখ দেখলেই বোঝা যায় তাঁরা খুবই বুদ্ধিজিভি।" কোলাব্যাঙ দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, "আমরা বনের মধ্যে একছত্রী সবাই, মোরগদের মধ্যে একমাত্র কুঁকড়োকে একদিন ভোজ দিতে মনস্থ করেছি। আপনার গান পৃথিবীকে আলোকিত, পুলকিত, চমকিত, সচকিত করেছে।" এক ব্যাঙ বললে, "সত্য আপনার গান···।" অন্য ব্যাঙ আকাশে চোখ তুলে বললে, "স্বর্গীয়।" "অথচ এই পৃথিবীরই।"— অন্য ব্যাঙ মাটিতে চোখ নামিয়ে বলে উঠল। সোনাব্যাঙ বললে, "স্বপনপাখির গান, সে কী তুচ্ছ আপনার গানের কাছে।"

কুঁকড়ো বলে উঠলেন, "কী বললে। স্বপনপাখির গান··· তুচ্ছ?··· একি সত্যি? না, তোমরা নিশ্চয় বাড়িয়ে বলছ।" কোলাব্যাঙ গম্ভীর স্বরে বললে, "স্বপনপাখির স্বপ্ন ভেঙে দিয়ে, সত্যিকার গানে বনকে মাতিয়ে তুলে দেয়, এমন একজনের বিশেষ দরকার হয়ে পড়েছে। একটু অদল-বদল না হলে আর পেরে ওঠা যাচ্ছে না।"

কুঁকড়ো দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, "সে কাজটা যদি আমার দ্বারা সম্ভব হয়, তবে আমি রাজি আছি।" সব ব্যাঙ ডেকে উঠল, একসঙ্গে কুঁকড়োর জয় দিয়ে, "কুঁক-ড়ো পাহাড়-ত-লির কুঁকড়ো-পা-হাড়—ত-লির।"

সোনাব্যাঙ গলা ভারী করে বললে, "এইবার স্বপনের দফা রফা হল।" কুঁকড়ো শুধলেন, "দফা রফা কী রকম।" কিন্তু কে তাঁর কথা শোনে। গলা ফুলিয়ে গান ধরলে সব ব্যাঙ-কটা করতাল বাজিয়ে—

মেঘ হাঁকে, "গড় কর্, গড় কর্, গড় কর্।"
বিষ্টি বলে, "টুপ টাপ, চুপ চাপ, ঝুপ ঝাপ।"
শিল বলে, "তড়-বড়, গড় কর্, গড় কর্।"

বাদল ঝরে গড় করি,
জলে ভাসে মাঠ, ঘাট আর বাট,
এলো বাতাস এলোমেলো,
লাফ দিয়ে ঝড় এলো
ঘাড় ধ'রে ব'লে গেল, "কর্ গড় কর্"··· ।

কোলাব্যাঙ ধুয়ো ধরলেন, "কে তারে গড় করে। কে কারে গড় করে।" সোনাব্যাঙ চিতেন গাইলেন, "বাতাস তারে গড় করে, সবাই তারে গড় করে।" ফেরতা গাইলে সব ব্যাঙ, "গড় কর্, গড় কর্। কর্ কর্ গড় কর্। গড় কর্, গড় কর্।" কুঁকড়ো ব্যাঙেদের শুধালেন, "স্বপনপাখির গান কেমন।"

ব্যাঙরা বললে, "আমরা কেউ থাকি পাথর-চাপা, কেউ থাকি কুয়োর তলায়, আমাদের কানে কেমন ক'রে সে গান আসবে। তবে স্বপন আমরা দেখি বটে, শীতের ক'মাস চব্বিশ ঘণ্টাই। গেছোব্যাঙকে শোধালে হয়, সে স্বপন আর পাখি দুই দেখেছে।"

কুঁকড়ো গেছোব্যাঙকে শুধালেন স্বপনপাখির গানের কথা।

গেছো তার কটকটে আওয়াজে পাখির গানের নকল দেখিয়ে দিলে, "দম ফাট্ দম ফাট্। হুয়ো হুয়ো হুয়ো হুয়ো···।" নকলটা মোটেই আসলের মতো হল না, কিন্তু কুঁকড়ো ভাবলেন সত্যিই স্বপনপাখি এমনিই গায়, তিনি ব্যাঙদের বললেন, "আহা বেচারা পাখি যদি এই গান গেয়েই খুশি থাকে তো থাক্-না। তার উপর উৎপাত ক'রে কী হবে। মশা মারতে কামান পাতবার কী দরকার।"

ব্যাঙরা বললে, "না মশয়, আপনার গান যেদিন শুনেছি, সেইদিনই বুঝেছি, কী বিশ্রী স্বপনপাখিটার গান। আপনার স্বর শুনলে আমাদের যেন ডানা গজিয়ে উঠে উড়তে ইচ্ছে হয়। আর তার গান, ছোঃ।" ব'লে সব ব্যাঙগুলো হাঁচতে লাগল। তাঁর গান শুনে ব্যাঙরা ডানা গজিয়ে সব উড়ে চলেছে এ ছবিটা মনে ক'রে কুঁকড়ো বেশ একটু আমোদ পেলেন। ব্যাঙরা তাঁর হাসি দেখে আরো জোরে ছাতা পিটতে লাগল, "জয় কুঁকড়ো, জয় কুঁকড়ো" ব'লে।

সোনালি বেরিয়ে এসে বললে, "এত গোল কিসের।" কুঁকড়ো বললেন, "ব্যাঙরা আমায়

ভোজের নিমন্ত্রণ করছে।" সোনালি অবাক হয়ে শুধলে, "তুমি যাবে নাকি ওদের ভোজেতে।" কুঁকড়ো বললেন, "আপত্তি কী। এরা সবাই বুদ্ধিজিভি। আমার গান এদের যদি ডানা গজাবার কাজে লাগে, তবে কেন আমি এদের সে সুখ থেকে বঞ্চিত রাখি। তোমার স্বপনপাখির গান তো সে কাজটা করতে পারলে না, উলটে বরং বেচারাদের দম ফাটিয়ে দেবারই জোগাড় করেছে। শোনো-না স্বপনপাখি ওদের কী গানই শুনিয়েছে।" কুঁকড়ো ব্যাঙেদের ইশারা করলেন, আর অমনি তারা সোনালিকে স্বপনপাখির গানের নকল দেখিয়ে দিলে, "দম ফাট্, দম ফাট্, হুয়ো হুয়ো হুয়ো। দম ফাট্ ফাট্ দম, হুয়ো হুয়ো।"

"শুনলে তো।" কুঁকড়ো সোনালিকে বললেন। ঠিক সেই সময় বনের শিয়রে নিশুত রাতের আঁধার কাঁপিয়ে একটি সুর এসে পৌঁছল, "পিয়ো।" কুঁকড়ো সেই মিষ্টি সুর শুনে চমকে বললেন, "ও কে ডাকে?" কোলাব্যাঙ তাড়াতাড়ি ব'লে উঠল, "কেউ নয়, ওই সেই পাখিটা।"

এবার আবার সেই স্বপনপাখির মিষ্টি সুর কুঁকড়োর কানে এল, যেন একটি-একটি আলোর ফোঁটা— "পিয়ো, পিয়ো। পিয়ো।" কুঁকড়ো শুনতে লাগলেন। একি পাখির ডাক। না এ স্বপ্নের বীণায় ঘা পড়ছে! সোনাব্যাঙ কী বলতে আসছিল, কুঁকড়ো তাদের এক ধমক দিয়ে সরিয়ে দিলেন। এইবার স্বপনপাখি গান ধরলে,

> পিয়া।
> আঁধার রাতের পিয়া, একলা রাতের পিয়া।
> পিয়ো, ওগো পিয়ো। দিয়ো, দেখা দিয়ো।
> আমায় দেখা দিয়ো, একলা দেখা দিয়ো।
> আঁধার-করা ঘরে, জাগছি তোমার তরে,
> অন্ধকারে পিয়ো, দিয়ো দেখা দিয়ো।

দেখতে দেখতে চাঁদের আলো জলে স্থলে এসে পড়ল। নীল আলোর সাজে সেজে অন্ধকারের পিয়া যেন বনের আঁধার-করা বাসরঘরে এসে দাঁড়ালেন। স্বপনপাখি আনন্দে গেয়ে উঠল, "পিয়ো, সুধা পিয়ো, সুধা পিয়ো পিয়ো পিয়ো।"

কুঁকড়ো বলে উঠলেন, "ছি ছি, ব্যাঙগুলোকে বিশ্বাস ক'রে কী ভুলই করেছি। হায়, এ লজ্জা রাখব কোথায়, ওগো স্বপনপাখি।" মধুর সুরে স্বপনপাখির উত্তর এল, "দিনের পাখি তুমি নির্ভীক, সতেজ ডাক দাও, রাতের পাখি আমি আঁধারে ডাকি, ভয়ে ভয়ে মিনতি ক'রে। কিন্তু বন্ধু, তুমিও যাকে ডাক, আমিও তাকে ডাকি। ওরা যা বলে বলুক, তুমি আমি এক আলোরই দূত।"

কুঁকড়ো বনের শিয়রে চেয়ে বললেন, "গেয়ে চলো, গেয়ে চলো রাত্রির স্বপন। আলোর দূত।"

আবার সুর উঠল আকাশ ছাপিয়ে তারার মধ্যে গিয়ে ঝংকার দিয়ে। বনের সবাই চাঁদের আলোয় বেরিয়ে দাঁড়াল সে সুর শুনে। গাছের তলায় আলো-ছায়া বিছানো, তারি উপরে হরিণ দাঁড়িয়ে শুনছে; কোটরের মধ্যে চাঁদের আলো পড়েছে, সেখান থেকে মুখ বাড়িয়ে বাচ্ছারা সব শুনছে; বনের পোকা-মাকড় পশু-পাখি সবার মনের কথা এক ক'রে নিয়ে স্বপনপাখি বনের শিয়রে গাইছে; জোনাকির ফুলকি, তারার প্রদীপ, চাঁদের আলোর মাঝে— নীল আকাশের চাঁদোয়ার তলায়। ব্যাঙের কড়া সুর থেকে আরম্ভ ক'রে ঝিঁঝির ঝিমে সুরটি পর্যন্ত সবই গান হয়ে এক তানে বাজছে যেন এই স্বপনপাখির মিষ্টি গলায়। কুঁকড়ো অবাক হয়ে বলে উঠলেন, "এ যে জগৎজোড়া গান, এর তো জুড়ি নেই। স্বপনপাখি কার কানে তুমি কী কথা বলে যাচ্ছ কে তা জানে।" অমনি কাঠবেরালি বললে, "অমনি শুনছি 'ছুটি হল, খেলা করো'।" খরগোস বললে, "আমি শুনছি 'শিশিরে-ভেজা সবুজ মাঠে চলো'।" বনবেরাল বললে, "শুনছি 'চাঁদের আলো এল'।" মাটি বললে, "বিষ্টির ফোঁটা পড়ছে যেন।" জোনাক বললে, "তারা আর তারা।" কুঁকড়ো তারার দিকে চেয়ে বললেন, "তোমরা কী শুনছ আকাশের তারা।" তারা সব উত্তর করলে, "আমরা নয়নতারার নয়নতারা।"

কাছে সোনাল-পাখি দাঁড়িয়ে ছিল, কুঁকড়ো তাকে শুধালেন, "আর তুমি কী শুনছ।" সে এক মনে শুনছিল, কোনো কথা কইলে না, কেবল "ওঃ!" ব'লে নিশ্বাস ফেললে।

কুঁকড়ো সোনালিকে বললেন, "যে যা ভালোবাসে স্বপনপাখি তাকে সেই গানই শুনিয়ে যায়। আমি কী শুনলেম জানো?—'দিন এল, গান গাও। ভোর ভয়ি, ভোর ভয়ি…'।"

সোনালি মুখ টিপে হেসে মনে-মনে বললে, "ভোরের বড়ো দেরি নেই, তুমি না গাইলেও ভোর আজ আসে কি না দেখাব তোমায়।"

কুঁকড়ো একেবারে মোহিত হয়ে গান শুনছিলেন; ভোর হচ্ছে, কিন্তু সেটা আজ তাঁর খেয়ালই হল না; তিনি বলে উঠলেন, "ওগো স্বপনপাখি, তোমার এ গানের পরে আর কোন্ লজ্জায় আমি গাইব?" স্বপনপাখি বললে, "গান বন্ধ তো করতে পার না তুমি।" কুঁকড়ো বললেন, "কিন্তু এর পরে সেই রগ্‌রগে আগুনের মতো রাঙা সুর কি কারো গাইতে ইচ্ছে হয়।" স্বপন উত্তর দিলে, "আমার গান আমারি মনে হয় যে, সময়ে সময়ে বড়ো বেশি নীল। আসল কথাটা কী জানো? যে সুরের স্বপ্ন তোমারো মনে, আমারো মনে জাগছে, সেটিকে সুরে বসাতে তোমারো সাধ্য হল না, আমারো ক্ষমতায় কুলোল না কোনোদিন। গানের পরে মন সে বলবেই, হল না হল না, তেমনটি হল না, এ কিছুই হল না।"

কুঁকড়ো বললেন, "সুরের পরশে ঘুম আসবে, তাকেই বলি গান।" স্বপন বললে, "গানের ডাকে জেগে উঠল, কাজে লাগল— তন্দ্রা ছেড়ে, তাকেই বলি গান।"

কুঁকড়ো বললেন, "আমার গান কি কোনোদিন কারু চোখে এক ফোঁটা জল আনতে পারবে।"

স্বপনপাখির উত্তর হল, "আর আমার গান কি কোনোদিন কিছু জাগিয়ে তুলবে। বন্ধু, দুঃখু নেই গেয়ে চলো, যেমন সুর পেয়েছি, ভালো হোক, মন্দ হোক, গেয়ে যাই যতক্ষণ—।"

'দুম' ক'রে বন্দুকের শব্দ হল। একটা আগুনের হলকা বিদ্যুতের মতো বনের শিয়রে চমকে উঠল। একটি ছোটো পাখি গাছের শিয়র থেকে কুঁকড়োর পায়ের কাছে ঝরা পাতার মতো ঝরে পড়ল।

সোনালি চীৎকার করে উঠল, "স্বপনপাখি রে, স্বপনপাখি।" কুঁকড়ো ঘাড় হেঁট ক'রে বলে উঠলেন, "ওরে মানুষ কী নিষ্ঠুর। কী নির্দয়।" স্বপনপাখি তাঁর দিকে কালো চোখ মেলে একটিবার চেয়ে দেখলে, তার পর একবার তার ডানা দুটি কেঁপে উঠে স্থির হল। সকালের হাওয়া আগুনে-ঝলসানো রক্তমাখা একটি ছেঁড়া পালক আস্তে আস্তে উড়িয়ে নিয়ে চলল, বনের পথে পথে হুহু করে কেঁদে।

হঠাৎ ওদিকের ঝোপঝাপগুলো মাড়িয়ে হোঁস ফোঁস করে হাঁপাতে হাঁপাতে জিম্মা হাজির।

কুঁকড়ো তাকে দেখে বললেন, "জিম্মা, তুমি এখানে যে। শিকার পৌঁছে দিতে না কি।"

জিম্মা ঘাড় হেঁট করে বললে, "এরা যে জোর করে আমায় শিকারে নিয়ে এল··· ।"

কুঁকড়ো এতক্ষণ স্বপনপাখিটিকে আড়াল করে আগলে ছিলেন, এবার সরে দাঁড়িয়ে বললেন, "চেয়ে দেখো কাকে তারা মেরেছে।"

জিম্মা ঘাড় নেড়ে বললে, "আহা যে গাছটি সুরে ভরা দেখবে, সেই গাছেই কি আগে গুলি চালাবে রাক্ষসগুলো। আমি আবার এদের হুকুম মানব!"—ব'লে জিম্মা ঘুরে বসল। তার পর, মাটির মধ্যে সব কারা চলাফেরা করতে লাগল, আর দেখতে দেখতে স্বপনপাখিকে পৃথিবী যেন কোলের মধ্যে আস্তে আস্তে টেনে নিতে লাগলেন।

দূরে শিকারীদের শিটি পড়ল। জিম্মা কুঁকড়োকে চট্‌পট্‌ গোলাবাড়িতে ফিরে যেতে ব'লে দৌড়ে চলে গেল শিকারীদের দিকে। এদিকে সোনালি কেবল দেখছিল কখন্‌ সকাল হয়। তার ভয় হচ্ছিল বুঝি কুঁকড়ো এইবার আকাশে চেয়ে দেখেন। কিন্তু কুঁকড়ো যেমন মাথা হেঁট ক'রে স্বপনপাখির জন্যে কাঁদছিলেন, সেই ভাবেই রইলেন। সোনালি আস্তে আস্তে তাঁর কাছে গিয়ে বললে, "এসো, আমার বুকে মুখ লুকিয়ে কাঁদো।" কুঁকড়ো নিশ্বাস ফেলে সোনালির কাছে সরে গেলেন, সে ডানায় তাকে ঢেকে নিলে। তার পর সেই সোনার ডানার মধ্যে ঢেকে সোনালি কত ভালোবাসাই জানাতে লাগল, কত মিষ্টি কথা, কত মিনতি, কত ছল। আর ও দিকে সকাল হতে থাকল, অন্ধকার ফিকে হয়ে এল, সব জিনিস স্পষ্ট হতে থাকল। কিন্তু তখনো সোনালি বলছে, "দেখছ আমি তোমায় কী ভালোবাসি।" তার পর হঠাৎ এক সময় ডানা সরিয়ে নিয়ে সোনালি ব'লে উঠল পালক ঝাড়া দিয়ে, "দেখেছ, কেমন সকাল এসেছে, তুমি না ডাকতেই।"

কুঁকড়ো চমকে আকাশে চাইলেন। তার পর বুক ফেটে তাঁর এমন সুর উঠল যে তেমন কান্না কোনোদিন কেউ শোনে নি। তিনি যেন পাষাণের মতো স্থির হয়ে গেলেন; আর চোখের সামনে তাঁর সকালের আলো মেঘে আকাশে গাছে ছড়িয়ে পড়তে থাকল।

সোনালি নিষ্ঠুরের মতো বললে, "শেওলাগুলো রাঙা হয়ে উঠল ব'লে!" "না, কখনো না!" ব'লে সেদিকে কুঁকড়ো ছুটে যাবেন, দেখতে দেখতে পাথরের গায়ে শেওলার উপরে সকালের আভা পড়ল আর সেগুলো আগুনের মতো লাল হয়ে গেল। সোনালি বললে, "ওই দেখো

পূর্বদিকে।" কুঁকড়ো "না" ব'লে যেমন সেদিকে চাইলেন, অমনি সোনায় আকাশ ভরে উঠল। "এ কী। এ কী।"—ব'লে কুঁকড়ো চোখ ঢাকলেন। সোনালি বললে, "পুবদিক কারু হুকুম মানে না, দেখলে তো?"

কুঁকড়ো ঘাড় হেঁট করে বললেন, "সত্যিই বলেছ। মন সেও হুকুম মানে, কিন্তু পুবদিক, সে কারু নয়। আজ আমি বুঝেছি কেউ কারু নয়।"

এই সময় জিম্মা ছুটতে ছুটতে এসে বললে, "গোলাবাড়িতে সবাই চাচ্ছে তোমাকে। পাহাড়তলি আর অন্ধকার করে রেখো না।" কুঁকড়ো জিম্মাকে বললেন, "হায়, এখনো তারা আমাকে আলোর জন্যে চাচ্ছে? আলো দেব আমি, এ কথা এখনো তারা বিশ্বাস করছে।" জিম্মা অবাক হয়ে রইল। কুঁকড়ো এ কী বলছেন। তার চোখে জল এল। সোনালি এবার সব অভিমান ছেড়ে ছুটে কুঁকড়োর কাছে গিয়ে বললে, "আকাশ আর আলো দুটোই কি আমার এই বুকের ভালোবাসার চেয়ে বড়ো? দেখো ওরা তো তোমায় চায় না, আর আমার বুক তোমায় চাচ্ছে।"

কুঁকড়ো ভাঙা গলায় বললেন, "হাঁ, ঠিক।" সোনালি ব'লে চলল, "আর অন্ধকার, সে কি আর অন্ধকার থাকে, যদি দুটি-প্রাণের ভালোবাসার আলো সেখানে—।" কুঁকড়ো তাড়াতাড়ি "হাঁ" ব'লে সোনালির কাছ থেকে সরে দাঁড়িয়ে সপ্তম-সুরে চড়িয়ে ডাক দিলেন, "আলোর ফুল।"

সোনালি অবাক হয়ে বললে, "গাইলে যে।"

কুঁকড়ো বললেন, "এবার আমি নিজেকে নিজে ধমকে নিলেম। বারবার তিনবার আমি যা ভালোবাসি, তা করতে ভুলেছি।" সোনালি শুধলে, "কী ভালোবাস শুনি।"

কুঁকড়ো গম্ভীর হয়ে বললেন, "কাজ, আমার যা কাজ তাই।" বলে কুঁকড়ো জিম্মাকে বললেন, "চলো, এগোও।" "গিয়ে করবে কী।" সোনালি শুধলে। "আমার কাজ সোনালি।" "কিন্তু রাত্রি তো আর নেই।"

কুঁকড়ো বললেন, "আছে, সব ঘুমন্ত চোখের পাতায়।"

সোনালি হেসে বললে, "আজ থেকে ঘুম ভাঙানোই বুঝি ব্রত হল তোমার। কিন্তু যাই বল, সকাল তো হল তোমাকে ছেড়ে, তেমনি ঘুমও ভাঙবে তুমি না গেলেও।"

কুঁকড়ো বললেন, "দিনের চেয়েও বড়ো আলোর হুকুমে আমায় চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সোনালি···।"

সোনালি গাছের তলায় মরা স্বপনপাখিটি দেখিয়ে বললে, "এও যেমন আর গাইবে না, তেমনি তোমার মনের সুরটি কোনোদিন আর ফিরে আসবে না।" ঠিক এই সময় সবাইকে অবাক করে দিয়ে বনের শিয়রে স্বপনপাখি ডাক দিলে, "পিয়ো পিয়ো।" ঠিক সেই গাছটির উপর থেকে যার তলায় রাতের স্বপন এখনো পড়ে আছে ধুলোয়। কুঁকড়ো উপর দিকে চেয়ে শুনলেন যেন আকাশবাণী হল, "শেষ নেই, শেষ নেই, বনের স্বপন অফুর।"

কুঁকড়ো আনন্দে ব'লে উঠলেন, "অফুর সুর, অশেষ স্বপন।" সোনালি বললে, "তোমার বিশ্বাস কি এখনো অটল থাকবে। দেখছ না সূর্য উঠছেন।" কুঁকড়ো বললেন, "কাল যে গান গেয়েছি তারি রেশ আকাশে এতক্ষণ বাজছিল সোনালি।"

এমন সময় পেঁচাগুলো চেঁচিয়ে গেল, "আজ কুঁকড়ো গায় নি, কী মজা।" "ওই শোনো, সোনালি, পেঁচারা স্পষ্টই জানিয়ে গেল যে, আলো আজ দেওয়া হয় নি। তাই আনন্দ করছে তারা।" ব'লে কুঁকড়ো সোনালির কাছে গিয়ে বললেন, "সকাল আমিই আনি। শুধু তাই নয়, বাদলে যখন পাহাড়তলিতে দিনরাত ঘন কুয়াশা চেপে এসেছে, দিন এল কি না বোঝা যাচ্ছে না, সেই-সব দিন আমার সাড়া সূর্যের জায়গাটি নিয়ে সবাইকে জানায় 'দিন এল, দিন এল রে, দিন এল'।"

সোনালি কী বলতে যাচ্ছিল, কুঁকড়ো তাকে বললেন, "শোনো।" সোনালি দেখলে, কুঁকড়ো যেন কতদূরে চেয়ে রয়েছেন, চোখে তাঁর এক আশ্চর্য আলো খেলছে। কুঁকড়ো আস্তে আস্তে বললেন, যেন মনে-মনে, "দূর সূর্যলোকের পাখি আমি। তাই না আমি ডাক দিলে নীল আকাশ ছেয়ে জ্ব'লে ওঠে সন্ধ্যার অন্ধকারে রাত্রির গভীরে আলোর ফুলকি। আমার দেওয়া আলো কোনোদিন কি নিভতে পারে। না আমার গান বন্ধ হতে পারে? কতদিন গাচ্ছি, কতদিন যে গাইব তার কি ঠিকানা আছে। যুগ যুগ ধ'রে এমনই চলবে···। আমার পর সে, তার পর সে গেয়ে চলবে— আমারি মতো অটল বিশ্বাসে। শেষে একদিন দেখা যাবে আকাশের নীল, তারায় তারায় এমনি ভরে উঠছে যে রাত আর কোথাও নেই, সব দিন হয়ে গেছে— আলোয়

আলোময়।" সোনালি অমনি শুধলে, "কবে সেটা হবে শুনি।" "কোনো এক শুভদিনে।" ব'লে কুঁকড়ো চুপ করলেন।

সোনালি বললে, "আমাদের এই বনটিকে ভুলো না যেন সেদিন।"

কুঁকড়ো বললেন, "কোনোদিন ভুলব না। এইখানেই জানলেম যে, এক স্বপন ভেঙে যায়, আর-এক স্বপন এসে দেখা দেয়, স্বপনের সঙ্গে নিজেও ভেঙে পড়া নয় কিন্তু জেগে ওঠা, নতুন আলোয় নতুন আশা নিয়ে।" সোনালি বুঝলে কুঁকড়ো আর থাকেন না, সে হতাশ হয়ে অভিমানে বলে উঠল, "যাও যাও, সেই খোপের মধ্যে রোজ সন্ধেবেলা ঘুম দিয়ো, নিজের অন্দর-মহলে মই বেয়ে উঠে।"

কুঁকড়ো উত্তর দিলেন, "ডানা খুলে উড়তে বনের পাখিরা শিখিয়েছে যে।"

"যাও, সেই ঝুড়ির মধ্যে মুরগি-গিন্নি এতক্ষণ কাঁদছে।"

কুঁকড়ো বললেন, "মা আমায় দেখে কী খুশিই হবেন।"

জিম্মা বললে, "আর বলবেন পুরোনো চাল ভাতে বেড়েছে রে।" ব'লে কুকুর ঠিক মুরগি-গিন্নির আওয়াজটা নকল করলে। কুঁকড়ো জিম্মাকে বললেন, "চলো যাওয়া যাক। আর কেন?"

সোনালি যেন সে কথা শুনেও শুনলে না। সে দেখাতে চায় কুঁকড়ো গেলে তার একটুও কষ্ট হবে না। কিন্তু আপনা হতেই তার চোখদুটি জলে ভরে এল। কুঁকড়ো তা দেখলেন, তাঁরও মন একটু উদাস হল। শেষে কুঁকড়ো জিম্মাকে সোনালির কাছে দু-একদিন থাকতে বললেন। জিম্মা অনেক দুঃখু সয়েছে, সে সোনালিকে বোঝাবার জন্যে কিছুদিন বনে থাকাই স্থির করলে। কুঁকড়ো বিদায় নিয়ে এবার সত্যিই চললেন, সোনালি আর থাকতে পারলে না, ছুটে গিয়ে কাঁদতে কাঁদতে তাঁকে বললে, "আমাকেও সঙ্গে নাও।" কুঁকড়ো তার মুখে অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন, "আলোর ছোটো বোন হয়ে থাকতে পারবে কি।" "কখনো না।" ব'লে সোনালি সরে দাঁড়াল। "তবে আসি।" ব'লে কুঁকড়ো এগোলেন। সোনালি রেগে বললে, "আমি তোমায় একটুও ভালোবাসি নে।" কুঁকড়ো তখন মাঝ-পথে ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, "কিন্তু আমি তোমায় সত্যিই ভালোবাসি, কেবল ভাবছি আমার দিনগুলির সঙ্গে যদি তুমি মিলতে পারতে।" বলতে-বলতে কুঁকড়ো বনের আড়ালে বেরিয়ে গেলেন। সোনালি রাগ-ভরে ব'লে

উঠল, "যেমন আমাকে ঠেলে গেলেন, তেমনি পড়েন পাখ্‌মারের পাল্লায় তো ডানাছুটি কেটে ছেড়ে দেয়।"

জিম্মা চুপটি ক'রে বসে সোনালির রকম-সকম দেখছে, এমন সময় কাঠঠোকরা নিজের কোটর থেকে মুখ ঝুঁকিয়ে বলে উঠল, "পাখ্‌মারটা কুঁকড়োকে তাগ করছে যে। কী বিপদ।" পেঁচারা অমনি গাছের উপর থেকে ছুয়ো দিয়ে বললে, "বেশ হয়েছে, খুব হয়েছে, কুঁকড়োর এবারে কর্ম কাবার।" খরগোসগুলো গড় থেকে ছুটে বেরিয়ে এল, একটা বাচ্ছা কান খাড়া করে দেখে বললে, "পাখ্‌মার বন্দুকটা মুচড়ে ভাঙলে যে।" আর একজন অমনি বলে উঠল, "না রে, গুলি ভরছে, দেখছিস না?"

জিম্মার দিকে সোনালি, সোনালির দিকে জিম্মা অবাক হয়ে চেয়ে রইল। জিম্মা, বললে, "ওরা কি কুঁকড়োর ওপরেও গুলি চালাবে।"

সোনালি বললে, "না। সোনালির দেখা যদি পায়, তবে সেইদিকেই বন্দুক ওঠাবে।" ব'লে সোনালি চলল। জিম্মা পথ আগলে বললে, "কোথায় যাও সোনালি।"

"আমার যেটুকু করবার সেই কাজটুকু করতে।" ব'লে বন্দুকের মুখে সোনালি উড়ে পড়তে চলল।

কাঠঠোকরা চেঁচিয়ে উঠল, "ফাঁদ। ফাঁদ। ফাঁদটা বাঁচিয়ে সোনালি।" কিন্তু তার আগেই সোনালিকে দড়ির ফাঁদ নাগপাশের মতো জড়িয়ে ফেলেছে। "তারা তাঁকে প্রাণে মারবে।" ব'লে সোনালি ধুলোর উপরে সোনার পাখা লুটিয়ে কাঁদতে লাগল। তার সব অভিমান চুর হয়ে গিয়ে কান্নার সুরে মিনতি করতে লাগল কেবলি সকালের কাছে, "হিমে সব ভিজিয়ে দাও, বারুদ না জ্বলুক, ভিজে ঘাসে শিকারীর পা পিছলে যাক অন্য দিকে। ওগো সকালের আলো, তুমি তোমার পাখিকে রক্ষে করো, যে-পাখি আঁধার দূর করে, আকাশের বাজকে ফিরিয়ে দেয়, সবার উপর থেকে। ওগো স্বপনপাখি, তুমি গেয়ে ওঠো, ঢুলে পড়ুক দুরন্ত মানুষের চোখের পাতা, স্বপ্নের রাজ্যে সে ঘুমিয়ে থাক্ তার মৃত্যুবাণের পাশাপাশি।"

স্বপনপাখি গেয়ে উঠল বন মাতিয়ে করুণ সুরে, "পিয়-পিয়, ও গোলাপের পিয়, ও আমাদের পিয়।" সোনালি দুখানি ডানা ধুলোর উপরে রেখে বললে, "আলো। তোমার পাখিকে বাঁচাও,

তার সঙ্গে সেই গোলাবাড়িতেই আমি চিরদিন থাকব, আর কোনোদিন অভিমান করব না তার উপরে।" অমনি সোনালি দেখলে আলো হতে আরম্ভ হল, চারি দিকে পাখিরা গেয়ে উঠল, আকাশ ক্রমে নীল হতে থাকল, বনের ঘুম আস্তে আস্তে ভাঙতে লাগল।

সোনালি মাটিতে মাথা নুইয়ে বললে, "আলোর অপমান, আলোর দূতের অপমান আর আমি করব না। হে আলোর আলো, আমায় ক্ষমা করো, তাঁকে বাঁচাও।" 'দুম' ক'রে ওধারে বন্দুক ছুটল, বনের সমস্তটা যেন রী-রী ক'রে শিউরে উঠল, তার পর কুঁকড়োর সাড়া এল, "আলোর ফুলকি।"

"তাগ ফসকেছে। গুলি ফসকেছে।"—পেঁচাটা কেঁদে উঠল। আর অমনি দিকে দিকে পাখি সব "জয় জীব। জয় জীব।" ব'লে কুঁকড়োর জয় দিয়ে উঠল। কোকিল উলু উলু দিয়ে বলতে লাগল, "শুভদিন এল— শুভদিন।" দেখতে দেখতে চারি দিক আলোময় হয়ে উঠল। সেই সময় বনের মধ্যে পায়ের শব্দ উঠল। সোনালি চোখ বুজে চুপ করে শুনতে লাগল, পায়ের ধ্বনি আস্তে আস্তে তালে তালে পড়ছে এক, দুই, তিন। কার ঠাণ্ডা হাতের যেন পরশ পেয়ে সোনালি চোখ খুলে দেখলে, পলাতকা কুঁকড়োকে বুকের কাছে ধ'রে কুঁকড়োর মনিব। সোনালি পালাবার চেষ্টাও করলে না; কুঁকড়োর পাশে গেরেপ্তার হয়ে গোলাবাড়িতে চলল। বসন্ত বাউরি পাহাড়তলি মাতিয়ে সুর ধরলে, "কথা কও, বউ কথা কও, কোথা যাও। বউ কোথা যাও। কথা কও, বউ কথা কও।"

—